মাসুদ রানা
শকুনের ছায়া
প্রথম খন্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনা
বেলাল

মাসুদ রানা

শকুনের ছায়া

[প্রথম খন্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশকে নিয়ে হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে দেশী-বিদেশী ধর্মান্ধ গোষ্ঠী। বাংলাদেশকে হাজার বছর পিছনে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। দেশী ষড়যন্ত্রকারীদের নামের তালিকা হাতে পড়ল এক সাংবাদিকের, কাবুলে সস্ত্রীক গ্রেফতার হলো সে। তাকে উদ্ধার করতে বারো সদস্যের কমান্ডো মিশন নিয়ে ছুটে গেল মাসুদ রানা। উদ্ধার করলও, কিন্তু তারপরই ফেঁসে গেল। থান্ডারবোল্ট মিশনকে পিক-আপ করতে না পেরে পালিয়ে এল প্লেন। গোটা আফগানিস্তান জুড়ে ওদের তাড়া করে বেড়াতে লাগলো কর্নেল নাজাফ মুরাদ।

পালাবার পথ নেই।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

বেলাল

EXCLUSIVE

BANGLAPDF

Please, Give us Some Credit When U Share Our Books

Visit Us At BANGLAPDF.NET

Scanning & Editing

BELAL AHMED

মাসুদ রানা ২৮৬

শকুনের ছায়া

[প্রথম খণ্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

BUY 29 6 01
ISBN 984 16 7286-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-286
SHOKUNER CHHAYA
[Part I]
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

উনত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক* মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত *এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ*লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা। সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন * বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য উদ্ধার *হামলা* প্রতিশোধ*মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত*স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল* দংশন*প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরু *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট *অমানিশা*সবাই চলে গেছে *অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল* বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ *মহাপ্রলয় *যুদ্ধবাজ* প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র।

এক

কাবুল, আফগানিস্তান।

'ডন! কি হলো, কিসের শব্দ?' গভীর ঘুমজড়ানো কণ্ঠে প্রশ্ন করল যুথি। পাশ ফিরে টেনে চোখ মেলল ডন উঠে বসেছে টের পেয়ে। 'কি...?'

'কেউ নক্ করছে দরজায়,' ফিসফিস করে বলল ডন। পা স্লিপারে গলিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'তুমি শুয়ে থাকো, আমি দেখছি।'

যতই আস্তে বলুক, গভীর রাতে প্রায় অন্ধকার হোটেলরুমে বেশ জোরে শোনাল ওর কথার আওয়াজ। 'এত রাতে!' চট্ করে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল মেয়েটি। 'রাত তিনটে বাজে! এখন কে...' থেমে গেল, সতর্ক সঙ্কেত বেজে উঠল মনের মধ্যে। চট্ করে হাত বাড়িয়ে স্বামীর হাত টেনে ধরল। 'যেয়ো না!'

এটা ঢাকা নয়, ওদের বাড়ি নয়, কথাটা খেয়াল হওয়ামাত্র আতঙ্কিত হয়ে উঠল যুথি। এটা কাবুল, আফগান রাজধানী। বড় অস্থির, বড় অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এখন এখানে। তালেবান নামে গোঁড়া এক ধর্মান্ধ গোষ্ঠী ক্ষমতায় জেঁকে বসেছে, ইসলামী বিপ্লবের নামে...আবার টোকার শব্দে কেঁপে উঠল মেয়েটি। কে? তালেবান বিপ্লবী কাউন্সিলের ওরা নয় তো?

ঘুমের রেশ উধাও হয়ে গেছে অনেক আগেই। উঠে বসল সে,

তাড়াতাড়ি ম্যাক্সি পরে নিল। 'ডন, যেয়ো না। নিশ্চয়ই তালেবান...'

'না। ওরা হলে এত আস্তে টোকা দিত না।' বেডরুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল সে, 'অন্য কেউ হবে। ঘাবড়িয়ো না, আমি দেখছি।' খুদে ড্রইংরুমের আলো জ্বেলে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল, 'কে?'

'মিস্টার ডন! দরজাটা খুলুন,' তেমনি চাপা জবাব এল।

চোখ কুঁচকে উঠল ওর। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল, তারপর খুলে দিল দরজা। মন বলছে লোকটা যেই হোক, ভয়ের কিছু নেই। আচমকা দরজা খুলে যেতে উল্টে আগন্তুকই ঘাবড়ে গেল, প্রায় লাফিয়ে উঠল ছোটখাট, বয়স্ক মানুষটা। আলোয় ঝিকিয়ে উঠল তার পুরু কাঁচের চশমা। হাতে একটা ছোট পোর্টফোলিও আছে তার।

অপ্রস্তুত হয়ে বোকার হাসি হাসল সে। 'সরি, এতরাতে বিরক্ত করতে হলো,' হড়বড় করে বলল। 'কিন্তু ব্যাপারটা এত জরুরী যে না এসে পারলাম না।'

'কি ব্যাপার? কে আপনি?' তাকে চেনা চেনা লাগল ওর।

ঢোক গিলল লোকটা। 'প্লীজ, ভেতরে ঢুকতে দিন আমাকে, মিস্টার ডন! খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ডকুমেন্টস নিয়ে এসেছি আমি আপনাকে দেয়ার জন্যে। নইলে এত রাতে নিশ্চই আপনাকে...'

'আপনাকে চেনা মনে হচ্ছে!'

সন্তুষ্টি ফুটল মানুষটার চেহারায়। মাথা দোলাল। 'তালেবান কমান্ড কাউন্সিলে দু'বার দেখা হয়েছে আমাদের। আমার নাম কারেমি। রাশিদ কারেমি। বিপ্লবী কাউন্সিলের অ্যাডভাইজার।

অবাক না হয়ে পারল না ডন। 'আরে, তাই তো! আসুন, কি ব্যাপার?' দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। কারেমি ঢুকতে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল। 'বসুন।'

'ডিসটার্ব করতে হলো বলে সত্যি দুঃখিত, মিস্টার ডন,' রুমাল বের করে ঘাম মুছতে মুছতে বলল আগন্তুক। 'আসলে এ ছাড়া…' পিছনে মৃদু পায়ের আওয়াজ উঠতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। মাঝারি উচ্চতার বব ছাঁট্ সুন্দরীকে দেখে চেহারা বিব্রত হয়ে উঠল। 'ইয়ে…মানে…'

'ও যুথি। আমার স্ত্রী,' বলল ডন। 'সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, বসুন। যুথি, ইনি মিস্টার…'

'আমি বলছি,' বাধা দিল লোকটা। 'আমি রাশিদ কারেমি, মিসেস ডন। তালেবান বিপ্লবী কাউন্সিলের অ্যাডভাইজার। এতরাতে আপনাদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে আমি খুব লজ্জিত। আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন।'

স্বামী-স্ত্রীর চোখাচোখি হলো। 'আপনি বসুন,' ডন বলল। 'আমার মত আমার স্ত্রীও সাংবাদিক। এ ধরনের ব্যাঘাতে আমরা একেবারে অনভ্যস্ত নই।'

'ধন্যবাদ, স্যার! অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ্ আপনাকে ধৈর্যের পুরস্কার দিন। আমি খুব অল্প সময় নেব।'

মুচকে হাসল ডন। পরিবেশ-পরিস্থিতি যেমনই হোক, আফগানরা প্রত্যেক কথায় অন্তত একবার করে আল্লাহ্কে স্মরণ করবেই। এর আগেও কয়েকবার এ দেশে ঘুরে গেছে সে, তাই ভালই জানে এদের এই সমস্ত ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে। যত গরীবই হোক, কোন আগন্তুককে নিজের বাড়িতে অতিথি হিসেবে পেলে সাধারণ আফগানরা কতভাবে তার সেবা করা সম্ভব, তাই নিয়ে রীতিমত গবেষণা করে। আজও সেই রীতি চলে এ দেশে, ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি, খুনোখুনি যতই হোক।

ইসলামের একটা নীতির ব্যাপারে এরা হিমালয়ের মত অটল, তা হলো অতিথি সৎকার। তার ওপর প্রতিবেশী ও মুসাফিরের

সমান অধিকার আছে, এই বিশ্বাস এদের অস্থিমজ্জাগত। গৃহস্থ গরীব হোক কি পয়সাওয়ালা, কোন তফাৎ নেই।

বাংলাদেশের ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক ডন সিদ্দিক পেশার খাতিরে শেষবার এদেশ ঘুরে গেছে এক বছর আগে। এখানকার রাজনীতি নিয়ে তার এক ডকুমেন্টারি প্রচার করে সেবার বিবিসি। ওই অনুষ্ঠানের বদৌলতে বর্তমান সরকারী মহলের উঁচু পদের প্রায় সবাই যথেষ্ট খাতির করে ওকে। ডকুমেন্টারিটা ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, তাই। অন্য কোন সাংবাদিক তেমন পাত্তা পায় না ওখানে।

এবারও বিবিসির তরফ থেকে এসেছে ডন। সঙ্গে নিয়ে এসেছে সদ্য বিয়ে করা বউ যুথিকে। সেও সাংবাদিক, ঢাকার এক নামকরা দৈনিকের ফটোগ্রাফার।

'শুনলাম আপনারা সকালের ফ্লাইটে ঢাকা ফিরে যাচ্ছেন,' বলে উঠল কারেমি। 'সত্যি নাকি?'

'কোথায় শুনলেন?'

জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল লোকটা। হাসল নার্ভাস ভঙ্গিতে। 'নেভার মাইন্ড। আমিও আজই দেশ ছাড়ছি বউ-মেয়ে নিয়ে। তাই এতরাতে আসতে হলো। ডকুমেন্টসগুলো আপনাকে দিয়েই...'

'কিসের ডকুমেন্টস? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। খুলে বলুন,' লোকটার মুখোমুখি বসল ডন। যুথিও বসল এসে ওর পাশে।

'বলছি, একটু গুছিয়ে নিতে দিন।' ঝুঁকে দু'হাতের ওপর মুখের ভর রেখে কার্পেট পরীক্ষায় মন দিল রাশিদ কারেমি। 'এ দেশে সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় আমি ছিলাম ফরেন সার্ভিসে। বিদেশের আধডজন এম্ব্যাসিতে কাজ করেছি। আপনাদের দেশেও

থেকেছি তিন বছর।' চুপ মেরে গেল লোকটা। আনমনা হয়ে পড়ল।

আবার চোখাচোখি হলো ডন-যুথির। আলোচনা কোনদিকে গড়াচ্ছে বুঝতে না পেরে অসহায় বোধ করছে। একটু পর আচমকা চোখ তুলল সে।

'আমরা, আফগানরা, এতই স্বাধীনচেতা যে আজ পর্যন্ত বাইরের কোন শক্তি আমাদের বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেনি। সে যত বড় শক্তিধরই হোক। চেঙ্গিস খান পারেনি, ইংরেজরা পারেনি, সোভিয়েতরাও পারেনি। বাইরের কেউ যা পারেনি, এখন আমরা নিজেরাই তাই করতে লেগেছি। নির্দ্বিধায় ভাইয়ের গলায় ছুরি চালাচ্ছি আমরা, সাফ করে দিচ্ছি লোকালয়ের পর লোকালয়। ক্ষমতার চেয়ারে বসার জন্যে কী না করছি?

'আফগানিস্তানের ধন-সম্পদ বলতে কোনকালেই কিছু ছিল না, আজ তো মোটেও নেই। ভেড়া আর উট ছাড়া কিছুই নেই আমাদের।' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কারেমি। 'যাক্‌গে, শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে নিশ্চয়ই এক বুড়োর দেশপ্রেমের ভাষণ শুনতে পছন্দ হবে না কারও।'

'বরং আসল প্রসঙ্গে এলে ভাল হয়,' ডন বলল। 'সাড়ে তিনটে বাজে। তৈরি হতে হবে আমাদের।'

'হ্যাঁ, ঠিক। আমাকেও তো···। আপনার দেশের ওপর ভয়ঙ্কর এক বিপদ ঘনিয়ে আসছে, মিস্টার ডন। আমি আপনাকে সে ব্যাপারে সতর্ক করতে এসেছি।'

'আমার দেশের ওপর!' অবিশ্বাস ফুটল সাংবাদিকের চেহারায়।

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল আত্মগত কারেমি। 'তিন বছর থেকে এসেছি আমি ওই দেশে। ওরকম সবুজ শ্যামল দেশ আর কোথাও

আমার চোখে পড়েনি। এখানকার গোঁড়া, ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর মত গোষ্ঠী আপনাদের ওখানেও আছে। সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপ্‌টি মেরে আছে ওরা। সুযোগ পেলেই...'

'খুলে বলুন, প্লীজ!'

যূথীর দিকে ফিরল লোকটা। 'গলা একদম শুকিয়ে গেছে। একটু পানি দেবেন দয়া করে?'

'নিশ্চয়ই!' চট্ করে উঠে পড়ল সে। পানি নয়, খুদে রেফ্রিজারেটর থেকে সবার জন্যে কোক ঢেলে নিয়ে এল। এক টানে অর্ধেক গ্লাস শেষ করে সুস্থির হলো লোকটা।

'শুকরিয়া! আল্লাহ্ আপনার হায়াত দরাজ করুন।' ডনের দিকে ফিরল সে। 'সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় এ দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পড়েছিল, সে তো বোধহয় আমার থেকে আপনিই বেশি ভাল জানেন। বিপুল অস্ত্র। হাল্‌কা-ভারী। ওসব কোত্থেকে আসত তাও নিশ্চই জানেন আপনি। রুশরা ভেগে যাওয়ার পর ওসবের রাষ্ট্রীয় অস্ত্রাগারে জমা পড়ার কথা ছিল, কিন্তু আহমেদ শাহ্ মাসুদ আর গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের জন্যে তা হয়নি। বরং আরও নতুন নতুন চালান এসেছে অস্ত্রের। বর্তমানে আমাদের খেতে যত গম আছে, তারচেয়ে বেশি আছে বোধহয় অস্ত্র।

'যা হোক, এই অস্ত্রের বড় একটা অংশ পাচার হয়ে যাচ্ছে আপনাদের দেশে।'

খুব একটা অবাক হলো না ডন বা যূথী। দেশে প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু অস্ত্র ঢোকে নানান পথে, ব্যাপারটা ওপেন সিক্রেট। তবে এ দেশ থেকেও যে যায়, সেটা অবশ্য এই প্রথম শুনল। 'কোন্ পথে যায়?' প্রশ্ন করল যূথী।

ডন যোগ করল, 'ক্রেতা কে বা কারা?'

'সাগরপথে টেকনাফ হয়ে যায়। ক্রেতা নেই, ফ্রী যায় সব।'

'মানে!' চোখ কুঁচকে উঠল ওর।

'আমাদের তালেবান সরকার পাকিস্তান-বাংলাদেশসহ অন্য সমস্ত মুসলিম প্রধান দেশে আফগানিস্তান মার্কা বিপ্লব ঘটানোর এক সুদূর প্রসারী নীল-নকশা করেছে। এক সৌদী ধর্মান্ধ ধনকুবের টাকা জোগাচ্ছে এর পিছনে।'

'কি বলছেন এসব?'

পোর্ট ফোলিও থেকে পুরু একটা খাম বের করল কারেমি। 'ঠিকই বলছি আমি, মিস্টার ডন। এটার মধ্যে তার সমস্ত প্রমাণ আছে।'

সম্মোহিতের মত খামের দিকে তাকিয়ে থাকল স্বামী-স্ত্রী।

'আপনাদের দেশী এক ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর কাছে জমা হচ্ছে এসব অস্ত্র। সাংগঠনিক কাজ চালাবার জন্যে প্রচুর টাকাও দেয়া হচ্ছে তাদের। টাকা সৌদী ধনকুবেরের, যাচ্ছে আমাদের তালেবান প্রতিনিধিদের হাত ঘুরে।'

'ডকুমেন্টস কি করে জোগাড় করলেন?' ভুরু নাচিয়ে খামটা দেখাল ডন।

'ওহ্, আমি বিপ্লবী কাউন্সিলের সিনিয়র-মোস্ট অ্যাডভাইজার। এসব জোগাড় করা আমার জন্যে খুব কঠিন নয়। আপনার দেশে যারা এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত, খুব শিগগিরি তারা ক্ষমতা দখল করতে যাচ্ছে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন, ওরা ব্যর্থ হবে না। যাতে ব্যর্থ হতে না হয়, সে জন্যে আটঘাট বেঁধে এগোচ্ছে।

'এই খামে বাংলাদেশী "তালেবানদের" নামের পুরো তালিকা আছে। ও দেশের ওপর আমার আলাদা এক টান আছে। আমি চাই না এদেশের মত ওখানেও রক্তের নদী বয়ে যাক্। এ দেশী তালেবানরা হাজার বছর পিছিয়ে নিয়ে গেছে আফগানিস্তানকে।

ওরা সফল হলে ওখানেও তাই ঘটবে। ডকুমেন্টসগুলো ঢাকায় নিয়ে যান দয়া করে। ওদের ঠেকান যে করে হোক।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ডন। 'আপনি কেন দেশ ছাড়ছেন?'

করুণ হাসি ফুটল কারেমির মুখে। 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।'

'পাপ?'

'নয়তো কি? তালেবানদের বাড়াবাড়ি আর সহ্য হয় না। মানুষকে মানুষ মনে করে না এরা। মেয়েদের তো একেবারেই না। আমার স্ত্রী তুর্কী, কাবুল ভার্সিটির প্রফেসর। আজ তাকেও বোরখা পরে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হয়। মেয়েটাকেও। এই পরিবেশে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছে না ওরা,' আপনমনে মাথা দোলাল সে।

'এ তো সবে শুরু। এরা যা করতে চাচ্ছে, তা সফল হলে একলাফে পাথর যুগে ফিরে যাবে আফগানরা। শহর ছেড়ে হিন্দুকুশের গুহায় গিয়ে থাকতে হবে তাদের। তার সাথে যোগ হয়েছে এই নতুন যন্ত্রণা,' খামটা দোলাল কারেমি।

'ভয়াবহ ষড়যন্ত্র চলছে, মিস্টার ডন। ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। যদি এদের নীল-নক্শা সফল হয়, এই অঞ্চলের বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশে দেশে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। তাই সময় থাকতে পালাচ্ছি আমি সবাইকে জানাতে। আপনি এখানে আছেন জেনে এগুলো দিতে এলাম অন্তত বাংলাদেশের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত হওয়া যাবে ভেবে। অনেক দিন থেকে লেগে ছিলাম এগুলো হাতাবার কাজে। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে সফল হয়েছি শেষ পর্যন্ত।

'ভয় হচ্ছিল হয়তো ধরা পড়ে যাব। কিন্তু পড়িনি। কিছু টের পায়নি ওরা। স্ত্রীর দেশে বেড়াতে যাব বলে ভিসা চাইতেই দিয়ে দিয়েছে ইমিগ্রেশন, কোন প্রশ্ন করেনি।'

'বড় অসম্ভব এক কাজ করেছেন আপনি,' মন্তব্য করল ডন।

'আল্লাহ্ সাহায্য করলে এরচে' অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়, মিস্টার ডন। এ কাজ তাঁর ইচ্ছেতেই করেছি আমি, মানে, করতে পেরেছি।'

বুকে হাত বেঁধে হেলান দিয়ে বসল সাংবাদিক। চোখ খামের ওপর, কপাল কুঁচকে আছে। 'ডকুমেন্টগুলো জেনুইন?'

'হোয়াই, ইয়েস!' বিস্ময় ফুটল কারেমির চেহারায়। 'জেনুইন!'

'আপনি জানতেন আমরা আজ চলে যাচ্ছি?'

'সেই জন্যেই তো এলাম। তালেবানদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ রিপোর্টিং করে ওদের কাছে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছেন আপনি, আমি জানি। প্লেনে খাম খুলে দেখবেন ভেতরে কি আছে, তাহলে বুঝবেন…' থেমে গেল লোকটা। ঘড়ি দেখল। 'এবার যেতে হয় আমাকে।'

কিছু বলল না ওরা। ডনের কপাল আগের মতই কুঁচকে আছে। যুথি টেবিল থেকে একটা দামী লেইকাফ্লেক্স ক্যামেরা তুলে নিয়ে আনমনে নাড়াচাড়া করছে। অনেকক্ষণ পর মাথা দোলাল সাংবাদিক। 'ঠিক আছে, মিস্টার কারেমি। ওগুলো নিয়ে যাচ্ছি আমি। আর…ইয়ে, ধন্যবাদ।'

'আমি তো নিমিত্ত মাত্র, সমস্ত ধন্যবাদ-প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য,' আঙুল তুলে সিলিং দেখাল রাশিদ কারেমি। 'তিনি না চাইলে আমি সফল হতাম না।'

উঠে পড়ল সে। ডান হাত বাড়িয়ে দিল। 'আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হোন। ফি আমানিল্লাহ্।'

হোটেলের উল্টোদিকে, বড় এক গাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একটা খুদে ফিয়াট গাড়ি। ভেতরে চালক ছাড়া কেউ নেই।

নিজের আসনে স্থির বসে আছে লোকটা, দাড়ির মধ্যে আঙুল ভরে গাল চুলকাচ্ছে। নজর হোটেলের বন্ধ ডাবল ডোরের ওপর।

নীল স্যুট পরা খাটো লোকটাকে বের হতে দেখল সে। পাথরের চওড়া সাতটা ধাপ পেরিয়ে রাস্তায় এসে ডানে-বাঁয়ে তাকাল লোকটা, তারপর খুব দ্রুত মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে গাড়ি থেকে বের হলো চালক। দৃঢ় পায়ে এগোল হোটেলের এন্ট্রান্সে দাঁড়িয়ে থাকা ফোন বুদের দিকে। স্লটে কয়েন ফেলে রিসিভার তুলল। ডায়াল করল 112 নাম্বারে।

ও প্রান্তের সাড়া পেতে পশতু ভাষায় দ্রুত বলল, 'কর্নেল নাজাফ মুরাদকে দাও, জলদি।'

কর্নেল মুরাদ তালেবান সরকারের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান। রুশরা চলে যাওয়ার পর যত সরকার এসেছে, তাদের বেলায়ও তাই ছিল সে। বুদ্ধিমান মানুষ, স্রোত যখন যেদিকে, সেদিকে ঘুরে যেতে ভারি পটু।

অল্প সময়ের মধ্যে সাড়া মিলল কর্নেলের। গলা একদম সতেজ, ঘুমের আভাসও নেই। 'কর্নেল মুরাদ!'

নিজের পরিচয় জানাল ওয়াচার। 'এইমাত্র হোটেল থেকে বেরিয়েছে সে, কর্নেল। বেশ উত্তেজিত মনে হয়েছে।'

কর্নেলের কাটা কাটা নির্দেশ শুনল সে কিছুক্ষণ, তারপর সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এল বুদ থেকে। গলির মাথায় একটা চায়ের দোকান সবে খুলেছে। উত্তরে, গাঢ় নীল আকাশের গায়ে হিন্দুকুশ পর্বতমালার আঁকাবাঁকা আউটলাইন ফুটতে শুরু করেছে একটু একটু। নতুন দিনের সূচনা হতে যাচ্ছে আফগানিস্তানে।

তাড়াতাড়ি গাড়ি ছোটাল সে। ফিয়াট দূরে সরে যেতে আরেক লোক এক সেকেন্ড হ্যান্ড জুতোর দোকানের পাশ থেকে বেরিয়ে এল। সেও দেখেছে রাশিদ কারেমিকে হোটেল থেকে বের হতে।

হাতে যে ফোলিওটা ছিল না, তাও নজর এড়ায়নি।

রাজপথের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে ডন ও যুথির হলুদ ট্যাক্সি। এঁকেবেঁকে, কড়া ব্রেক কষে, হর্ন বাজিয়ে এগোতে হচ্ছে। আগের মতই আছে আফগানরা, সাইড দেয় না কাউকে।

ডনের ভালই জানা আছে এদের এই স্বভাব। আগে কখনও ব্যাপারটা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি, কিন্তু আজ হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এয়ারপোর্ট পৌঁছতে চাইছে সে। অস্বস্তি লাগছে, বারবার নড়েচড়ে বসছে।

সামনে এক মার্সিডিজ পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ব্রেক কষল ওদের ড্রাইভার। জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচিয়ে কী সব বলতে লাগল। ওটার চালকের উদ্দেশে চোখা দেশী অস্ত্র ঝাড়ছে। কিন্তু সে নিরুপায়। কারণ তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে একপাল গাধা, কোনমতে ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে কিছুটা যেতেই আবার বাধা। জমজমাট বাজার বসেছে পথের ওপর। মলিন সালোয়ার-কুর্তা পরা চাষীরা দরদাম করছে ক্রেতার সাথে। চাদর মুড়ি দেয়া কয়েকজন বৃদ্ধা ভিক্ষুক ছাড়া আর কোন মেয়ে চোখে পড়ল না ওদের। অথচ আগে বেশিরভাগ কেনাকাটা মেয়েরাই করত।

হতচ্ছাড়া চেহারা সবার। পথের পাশের ঝুপড়ি খাবার দোকানে মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে। একহাতে মাছি তাড়াচ্ছে আর অন্য হাতে রুটি খাচ্ছে মানুষ।

'তুমি খুব অস্থির হয়ে পড়েছ, ডন,' যুথি বলল মৃদু গলায়। এক হাত রাখল ওর কাঁধে।

জোর করে হাসল সে। কৌতূহলী স্ত্রীকে দেখল। এ দেশে যুথির প্রথম সফর ছিল এটা, প্রথম থেকে সবকিছুতেই গভীর

আগ্রহ ছিল। এখনও আছে। কুচকুচে কালো চুল.চমৎকার প্রিন্টের স্কার্ফ দিয়ে ঢেকেছে ও। জিনস এবং সাদা কটন ড্রিল শার্ট পরেছে। সব মিলিয়ে দারুণ মানিয়েছে।

'হ্যাঁ। আসলেই খুব টেনশনে আছি। এ দেশ না ছাড়া পর্যন্ত সুস্থির হতে পারব না।'

'অনর্থক টেনশন করছ তুমি। ওগুলো কোথায় আছে, বলে না দিলে কেউ টেরই পাবে না। তাহলে কেন শুধু শুধু ভাবছ? আমার ভয় হচ্ছে কেউ শেষ পর্যন্ত তোমার চেহারা দেখেই কিছু সন্দেহ না করে বসে।'

ঠিকই বলেছে ও, ডন ভাবল। ওর সন্দেজনক আচরণ দেখে কেউ কিছু ভেবে বসতেও পারে। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তালেবান চর, কাজেই সতর্ক হওয়া উচিত। এখন একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই সর্বনাশ। আবার যুথিকে দেখল ডন। একদম শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন। ওর নার্ভ বলে আছে কিছু? এ মুহূর্তে ওর মত যদি হতে পারত সে, বড় ভাল হত।

ঘড়ি দেখল–প্রায় নয়টা। আর মাত্র দেড় ঘণ্টা আছে ফ্লাইট ছাড়ার। সোয়া নয়টায় প্রকাণ্ড এয়ারপোর্ট ভবনের সামনে ব্রেক কষল ট্যাক্সি। লাগেজপত্র সামলে টার্মিন্যাল ভবনের প্লেট গ্লাস ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল ওরা। চারদিকে অযত্ন আর অবহেলার ছাপ। যাত্রীর চাপ নেই তেমন। যা আছে তার বেশিরভাগই বিদেশী, আফগান কতজন আছে হাতে গুনে বলা যায়।

ভেতরের পরিবেশে কেমন এক বিপদ বিপদ গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে মনে হলো ডনের। নাক টানলেই বুঝি টের পাওয়া যাবে। দুনিয়ার আর সব এয়ারপোর্টের ডিপারচার লাউঞ্জে যেমন ব্যস্ত আনাগোনা, ভদ্র হৈ-চৈ থাকে, কাবুল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার কিছুই নেই। আশ্চর্যরকম নীরব সবাই। যেন কারও

সমাধিক্ষেত্র এটা, সবাই এসেছে মৃতের কাছে নীরবে শোক প্রকাশ করতে।

অবশ্য বাচ্চারা নেই ওসবের মধ্যে। ওরা ওদের জগৎ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। বিশাল টাইলড্ ফ্লোরে ছোটাছুটি করছে, চ্যাঁচাচ্ছে। ওরাই জ্যান্ত রেখেছে ভেতরের পরিবেশ।

কয়েকটা কাউন্টারের সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীরা। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সারি। চারদিকে দ্রুত নজর বুলিয়ে নিল ডন। আসার দিন ভেতরে স্বঘোষিত তালেবান বিপ্লবী গার্ডদের বেশ কয়েকজনকে দেখেছিল, আজ একজনকেও চোখে পড়ছে না। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবল, আজ বোধহয় নেই ব্যাটারা। নাকি ঘাপ্‌টি মেরে আছে কোথাও?

যূথীকে কিছু বলার জন্যে মুখ ঘোরাতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা চিৎকার শুনে কলজে লাফিয়ে উঠল ওর। ঝট্ করে ঘুরে তাকাল সেদিকে। যুবক বয়সী তিন-চারজন দাড়িওয়ালা লোক নীল স্যুট পরা বয়স্ক একজনকে টেনে বের করে আনছে লাইনের মাথা থেকে। লোকটার চোখে পুরু কাঁচের চশমা।

হৃৎকম্পন মুহূর্তের জন্যে থেমেই দ্বিগুণ হলো ডনের। রাশিদ কারেমি! 'ডন!' ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল যূথী। 'সেই...'

'চুপ্!' দ্রুত বলল ও। হাত-পা কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। 'একদম চুপ করে থাকো।'

সত্যি তাই। টেনে-হিঁচড়ে বের করে এনেছে ওরা লোকটাকে, তার তীব্র প্রতিবাদ কানেই তুলছে না। কারেমির পাশেই বোরখা পরা দু'জনকে দেখা গেল। মুখের পর্দা সরিয়ে ফেলেছে তারা, আতঙ্কে ফ্যাকাসে চেহারা দেখতে পাচ্ছে ডন। বয়স্কজন নিশ্চই কারেমির তুর্কী স্ত্রী হবে। অন্যটি মেয়ে। সতেরো-আঠারো হবে হয়তো বয়স। হাউমাউ করে কাঁদছে মেয়ে।

যূথীর দিকে তাকাল ডন। ওর চেহারাও মড়ার মত ফ্যাকাসে। ঠোঁট সাদা। 'এসো,' কোনমতে বলল ও। 'জলদি!'

হুই-চইয়ের দিকে এক চোখ রেখে লাইনে দাঁড়াল ওরা। এক গোমড়া অফিসার লাগেজ চেক করল দু'জনের। অহেতুক বেশি সময় লাগাল ব্যাটা। সব ওলট-পালট করে একাকার করল। ঝামেলা বাধল যূথীর সুটকেস নিয়ে। কাপড়ের নিচ থেকে কয়েক রোল কোডাক্রোম উঁকি দিচ্ছে দেখেই তার চেহারা বিগড়ে গেল। 'এগুলো···কি?' এমনভাবে তাকাল যেন বাপের জন্মে ফিলম্ দেখেনি। কর্কশ আঙুল দিয়ে ডলাডলি করতে লাগল সিল্কের মত মোলায়েম সেলুলয়েড।

চালে কাজ হয়েছে ভেবে খুশি হলো যূথী। তবু চেহারায় অসন্তোষ ফুটিয়ে তুলল। অফিসারের ঘাড়ের ওপর দিয়ে এক গাঢ় সবুজ ড্রেস পরা পাঠানকে উঁকি দিতে দেখে বলল, 'প্লীজ, ওগুলো নষ্ট করবেন না। আমি ফটোগ্রাফার, অনেক দিন ধরে ছবিগুলো তুলেছি। আপনাদের সফল বিপ্লবের দলিল ওগুলো। ওগুলো ছাপা হলে পৃথিবী জানবে···

'কি জানবে?' অফিসারকে অগ্রাহ্য করে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে উঠল পাঠান।

বুঝতে না পেরে চোখ তুলল যূথী, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল।

'আমাদের বিপ্লব?' আবার বলল সে। 'কোন দরকার নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ফটোগ্রাফাব ছাড়া চলে গেছে আমাদের। আজও চলবে।'

'কিন্তু···'

'কোন কিন্তু নেই, মোহ্তারমা।'

অধৈর্যের মত মাথা ঝাঁকাল যূথী। 'আপনি বুঝতে পারছেন না, আমি সৌখিন ফটোগ্রাফার নই, প্রফেশনাল। ওই ফিলম্ খোয়া

গেলে আমার ম্যানেজমেন্টকে কি জবাব দেব আমি? চাকরি চলে গেলে খাব কি?'

'কেন, আপনার মরদ খাওয়াবেন!' বাঁকা চোখে ডনের দিকে তাকাল পাঠান। তারপর, যেন এইমাত্র দেখল, এমনভাবে যূথীর গলায় ঝোলানো ক্যামেরা তিনটে দেখল। 'ইউ স্মার্ট লেডি, ইয়েস? একসঙ্গে তিনটা করে ছবি তোলেন?'

আশপাশে ছোটখাট ভিড় জমে গেছে দেখে বিব্রত বোধ করল ওরা। বেশিরভাগই কালো ড্রেস পরা মোল্লা, কাঁধে অত্যাধুনিক অটো রাইফেল। তালেবান গার্ড। শকুনের চোখে তাকিয়ে আছে যূথীর বুকের দিকে।

'এক মেয়ের জন্যে তিন ক্যামেরা অনেক বেশি হয়ে যায়, মোহ্তারমা!' বলে হাত বাড়াল সবুজ সালোয়ার-কুর্তা। 'দেখি, একটা দিন তো আমাকে!'

অসহায়ের মত ডনের দিকে তাকাল ও, তারপর সবচেয়ে পুরানো ৩৫ এমএম লেইকাফ্লেক্সটা তুলে দিল। নিল সে। হলুদ দাঁত বের করে হেসে হ্যাসেলব্লডটা ইঙ্গিত করল, 'ওটাও দিন। একজনের জন্যে একটা ক্যামেরাই যথেষ্ট।'

খানিক ইতস্তত করে ওটার স্ট্র্যাপ ধরল যূথী। 'তাহলে আমার ফিলম্ ফেরত দিচ্ছেন তো? ওগুলো আমার...'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়! ওগুলো আমাদের কোন কাজে আসবে না। এমনিতেও মিস্টার কোডাককে একদম পছন্দ করি না আমরা।'

বলল বটে, তবে তৎপর হতে দেখা গেল না তাকে। বরং ধীরেসুস্থে রোলগুলো একটা একটা করে আলোর সামনে মেলে ধরল। সব ছবি বরবাদ হয়ে গেছে নিশ্চিত হয়ে আরেকবার হলুদ দাঁত দেখাল। 'ধন্যবাদ, লেডি। এই নিন্। ফিলম্গুলো দেখে মনে হয় না কোন আপত্তিকর ছবি তুলেছেন আপনি।'

অকেজো সেলুলয়েডের ফিতে দলা পাকিয়ে ফেরত দিল সে। 'দুটো ক্যামেরা গিফট্ করার জন্যে ধন্যবাদ। এবার যেতে পারেন আপনারা,' বলে নিজেই সরে গেল সে সামনে থেকে।

'হারামজাদা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল যূথী।

'চেপে যাও। আপদ গেছে তাইই বেশি।'

কাউন্টারের ঝামেলা সেরে সিকিউরিটি ডোরের দিকে এগোল। নীল ইউনিফর্মের ফিটফাট এক ন্যাশনাল পুলিস দাঁড়িয়ে আছে গেটে, অস্বাভাবিক সময় নিয়ে প্রতিটা পাসপোর্ট-ভিসা, টিকেট ইত্যাদি চেক্ করছে। তার একজিট স্ট্যাম্প সীল করার ধাক্কায় চারদিক কাঁপছে।

গেট অতিক্রম করতে পেরে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন ওদের। 'ওফ্, বড় বাঁচা বাঁচলাম!' ফিস্‌ফিস করে বলল ডন।

'কারেমির কি হলো?' প্রশ্ন করল যূথী।

'জানি না। দেখব কখন, শালাদের যন্ত্রণায়...' থেমে গেল সে কথা শেষ না করে। পিছন ফিরে লাউঞ্জের পরিস্থিতি দেখার ইচ্ছে বহু কষ্টে দমন করল। সোফার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, এই সময় এল ডাকটা। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত জমে গেল।

'মিস্টার ডন! মিসেস ডন!'

প্রথমে ওরা ভেবেছিল পিছন থেকে এসেছে বুঝি, কিন্তু না, সামনে থেকে এসেছে। চেক্ আউট ডেস্কে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ছয় ফুটের কিছু বেশি হবে দৈর্ঘ্যে, তাগড়া স্বাস্থ্য। মুখটা চৌকো। ধূসর মোহায়ের স্যুটে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে তাকে। হাসিটাও আন্তরিক। সে ডাকছে।

কিন্তু তার পিছনেই দু'হাত বুকে বেঁধে দাঁড়ানো দুই পাঠানকে দেখে আত্মা উড়ে গেল ওদের। ওদের একটার হাতেই সামান্য আগে ক্যামেরা তুলে দিয়েছে যূথী—ওর নাম আলি। অন্যজন তার

সঙ্গী, ইরাজ। পরপর কয়েকটা বিট্ মিস করল ডনের হার্ট। ওরা কখন এল? কোন্‌দিক থেকে?

'আমি কর্নেল নাজাফ মুরাদ,' হাসিমুখে বলল মোহায়ের স্যুট। 'আফগান ইন্টারনাল সিকিউরিটি চীফ। আপনাদের পাসপোর্ট আর টিকেটগুলো আমাকে দিন, প্লীজ!'

'কেন?' অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল ডন। 'আমরা তো···'

'কোন প্রশ্ন নয়, স্যার। প্লীজ।'

রাগে, আশঙ্কায় অল্প অল্প কাঁপছে যূথী। ছোট এক রূমে একদম নগ্ন দাঁড়িয়ে আছে ও, শার্ট-ব্রা-জিনস পায়ের কাছে পড়ে আছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো বোরখায় ঢাকা দুই মেয়ে গার্ড ওকে সার্চ করছে। শুধু চোখ ছাড়া তাদের আর কিছুই দেখা যায় না।

আধঘণ্টা ধরে ভেতর-বার সার্চ করে সন্তুষ্ট হলো ওরা। কাজ সেরে টিস্যু পেপারে আঙুল মুছে সম্ভবত হাসল একজন, অন্তত তার চোখের কোণ দেখে তাই মনে হলো। পরক্ষণে দু'আঙুলে ওর স্তনের বোঁটা ধরে জোরে চাপ দিল সে। চেহারার প্রতিক্রিয়া অনেক কষ্টে ঠেকালেও চোখের পানি ঠেকাতে পারল না যূথী।

ওকে ছেড়ে ওর পরিধেয় নিয়ে পড়ল এবার মেয়ে দুটো। ব্লেড দিয়ে যেখানে সেখানে কেটে 'আপত্তিকর' জিনিস খুঁজল। না পেয়ে ইশারায় ওগুলো পরতে বলল। ডাক পেয়ে ইরাজ এসে রূমে ঢুকল, পথ দেখিয়ে যূথীকে বাইরে নিয়ে এল। রূমের সামনের ছোট করিডরে ডনকে দেখল ও। এলোমেলো চেহারা। শার্ট-প্যান্টের এখানে-সেখানে ব্লেডের পোচ।

চোখ কুঁচকে স্ত্রীকে দেখল সে। তাড়াতাড়ি কাছে এসে এক হাতে জড়িয়ে ধরল। বাহু চাপড়ে সাহস জোগাল। 'ভয়ের কোন কারণ নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে, ধৈর্য ধরো।'

বুট জুতোর আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল ওরা। বাঁক ঘুরে কর্নেল মুরাদকে আসতে দেখল। সঙ্গে আলি। কাছে এসে চোখ কুঁচকে ওদের দেখল কর্নেল, তারপর মাথা দুলিয়ে হতাশা প্রকাশ করল। 'আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও দেশদ্রোহিতামূলক কর্মকাণ্ডের গুরুতর অভিযোগে আপনাদের দু'জনকে গ্রেফতার করা হলো। এর অর্থ কি নিশ্চয় বোঝেন আপনারা। বোঝেন না?'

রেগে উঠল ডন। 'হাজারবার বলেছি আপনার অভিযোগ মিথ্যে। আমরা কোন অপরাধ করিনি।'

পাত্তা দিল না কর্নেল মুরাদ। একঘেয়ে কণ্ঠে বলে চলল, 'আমাদের কাছে খবর আছে আজই খুব ভোরে আমাদের দেশী এক বেঈমান, ইসলামের শত্রু, দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একান্ত গোপনীয় কিছু দলিল নিয়ে আপনাদের হোটেল রূমে গিয়েছিল। আপনাদের ওসব দিয়েছে সে, এবং আপনারা দু'জন তা চোরাচালান করে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। আফগানিস্তানের বাইরে সেসব ছাপিয়ে তালেবান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে চাইছিলেন।'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল ডন। 'রাবিশ!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'রাবিশ! আমি তালেবান সরকারের স্বপক্ষে ছাড়া বিপক্ষে কিছু লিখিনি কখনও, এদেশের হাই-অফিশিয়াল সবাই তা জানে। আগেও অনেকবার এ দেশে এসেছি আমি, ভবিষ্যতেও আসার ইচ্ছে আছে। দেশে-বিদেশে আপনাদের সফল বিপ্লবের খবর বিক্রি করে যথেষ্ট টাকা আয় করি আমি, সেধে কেন সে সুযোগ নষ্ট করব?'

'তাছাড়া সার্চ করে কিছুই তো পাননি আপনারা!' যোগ করল যূথী। 'ওই দুই ডাইনী...'

'হ্যাঁ, পাইনি,' বাধা দিয়ে বলল কর্নেল মুরাদ। 'কিন্তু তাতে

প্রমাণ হয় না কিছুই। গার্ডদের রিপোর্ট পেয়ে পরিষ্কার বুঝেছি আমি, আপনি, মিসেস ডন, ইচ্ছে করেই সুটকেসের ওপরদিকে কিছু ফিল্‌ম রেখে দিয়েছিলেন। সহজেই যাতে ওগুলো সবার চোখে পড়ে। অল্পে ছাড়া পেয়ে যান আপনারা। অথচ আমি নিজে সার্চ করে নিচের দিকে আরও কিছু ফিল্‌ম পেয়েছি। একই সুটকেসে দুই জায়গায় কেন রেখেছেন ফিল্‌ম?'

'আমি...'

'সরি, মিসেস ডন। আমি নিশ্চিত জানি আজ ভোরে কিছু গোপন ডকুমেন্টস আপনাদের হাতে পড়েছে। অথচ ওগুলো পাইনি খুঁজে। এই অবস্থায় আপনাদের কিছুতেই যেতে দেয়া সম্ভব নয়। ব্যাপারটা আমি রিপোর্ট করতে যাচ্ছি আমাদের সুপ্রীম কাউন্সিলের কাছে। যতদিন কোন সিদ্ধান্ত না হয়, ততদিন জেলে থাকতে হবে আপনাদের।' কথা শেষ করে আচমকা ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল, গট্‌গট্ করে হেঁটে চলে গেল।

ওদের দু'জনকে হাতকড়া পরিয়ে সিকিউরিটি ভ্যানে তোলা হালো। অজস্র কৌতূহলী চোখের সামনে দিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল ভ্যান।

দুই

বিসিআই, ঢাকা।

'নামটা চেনা চেনা লাগছে!' চিন্তিত গলায় বলল মাসুদ রানা।

'মনে হয় আমিও তার দু'একটা রিপোর্ট পড়েছি পত্রিকায়।'

মাথা ঝাঁকালেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। 'হতে পারে। প্রায়ই ছাপা হয়। বিবিসি-সিএনএন এরমধ্যে তার কয়েকটা ডকুমেন্টারি কিনে প্রচারও করেছে। ওই লাইনে বেশ পরিচিত সাংবাদিক। তার স্ত্রীও ফটোগ্রাফার হিসেবে যথেষ্ট রেপিউটেড।'

পুরো ঘটনা মনে মনে আরেকবার নেড়েচেড়ে দেখল ও। বৃদ্ধ যা বললেন, তার সারমর্ম হচ্ছে: ফাহমিদা ও হামিদা নামের দুই আফগান মেয়ে, প্রথমজন তালেবান বিপ্লবী কাউন্সিলের অ্যাডভাইজার রাশিদ কারেমির ব্যক্তিগত সহকারী, অন্যজন কাবুলের বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের। কারেমি এক সময় বাংলাদেশের আফগান দূতাবাসের পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার ছিল। ওদেশে মেয়েদের বাইরের কাজ নিষিদ্ধ করা হলেও দূতবাসের মেয়ে কর্মীদের ব্যাপারে এখনও সরাসরি কোন নির্দেশ দেয়নি সরকার। অন্যদিকে রাশিদ কারেমি হাই অফিশিয়াল বলে তার পি.এসও নির্বিঘ্নে কাজ করেছে এতদিন।

তালেবানদের ইদানীংকালের কিছু কিছু কাজ নাকি কারেমি মেনে নিতে পারছিল না, এসব নিয়ে বাসায় প্রায়ই স্ত্রীর সাথে আলোচনা হত তার। একদিন তাকে বারবার বাংলাদেশ শব্দটা উচ্চারণ করতে শুনে সন্দেহ হয় ফাহমিদার, আড়াল থেকে তাদের আলোচনার পুরোটা শোনে সে। রাতে ছোট বোন হামিদাকে জানায় ঘটনা, সে তা জানায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত ফারুখ হোসেনকে।

পরদিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে বিসিআইকে পুরো ঘটনা জানানো হয় তার রিপোর্টসহ। তালেবানরা কিছু ধর্মান্ধ বাংলাদেশীর সাহায্যে এ দেশে মারাত্মক কিছু ঘটাতে তৈরি হচ্ছে বলে সতর্ক করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে করাচী বিসিআই এজেন্টদের

একজনকে কাবুলে পাঠিয়ে দেন রাহাত খান।

তার পাঠানো খবর অনুযায়ী পাঁচদিন আগে রাশিদ কারেমি এ ব্যাপারে কিছু গোপন তথ্য সাংবাদিক ডন সিদ্দিককে দিতে তার হোটেলে যায়। দিয়েওছিল সে। পরদিন সকালে সস্ত্রীক ঢাকা ফিরে আসার কথা সাংবাদিকের, রাশিদ কারেমিও বউ-মেয়ে নিয়ে তুরস্কে চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু এয়ারপোর্টে ধরা পড়ে যায় সবাই।

ওদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা চীফ কর্নেল মুরাদ গ্রেফতার করে তাদের। গোপন ডকুমেন্টসের খোঁজে সাংবাদিক যুগলকে অনেকক্ষণ ধরে সার্চ করে সে, কিন্তু পায়নি কিছু। ওদিকে কারেমি জেলখানায় আত্মহত্যা করেছে।

বিসিআই এজেন্ট ওখানকার বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের ওখানে ফাহমিদার সাথে কথা বলে যে তথ্য পেয়েছে, তা হচ্ছে...ইত্যাদি।

এরপর গত পরশু আরেক মেসেজ পাঠিয়েছে সে। তাতে বলেছে, ডকুমেন্টগুলো কারেমি ডনকে দিয়েছে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুরাদ এখনও ওগুলো উদ্ধার করতে পারেনি। ওগুলোর খোঁজ বের করার জন্যে সাংবাদিক যুগলের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে মুরাদ।

চেয়ার ছাড়লেন রাহাত খান। ধীর পায়ে পিছনের জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন ঝাড়া পাঁচ মিনিট। চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ। নিভে যাওয়া পাইপ টানছেন আনমনে। ঘুরলেন বৃদ্ধ। সরাসরি ওর দিকে তাকালেন। কিন্তু রানার মনে হলো ওকে দেখছেন না, ওর খুলি ভেদ করে পিছনে চলে গেছে তাঁর নজর।

'সাতাশ বছর পুরো হলো স্বাধীন হয়েছি,' থমথমে গলায় বলে উঠলেন। 'সাতাশ বছর! অথচ কি আশ্চর্য, এক ইঞ্চিও এগোতে

পারল না দেশ। সেই একাত্তরেই রয়ে গেছি সবাই। রাজনীতিকদের হালুয়া-রুটি ভাগাভাগি আর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি আজও শেষ হলো না, কেউ দেশকে এগিয়ে নেয়ার কোন চেষ্টাই করল না। সবাই কেবল অতীত নিয়ে জাবর কাটে, ও অমুক করেছে, সে তমুক করেছে।

'এখন শুনি আমাদের হাজার বছর পিছিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে।' ফিরে এসে বসলেন তিনি। 'সরকারী আর বিরোধী রাজনীতিকরা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত বলেই আজ এমন সব ভয়ঙ্কর খবর শুনতে হচ্ছে। ওদের কতবড় সাহস লাখ লাখ শহীদের রক্তের সাথে এতবড় বেঈমানীর স্বপ্ন দেখে!'

'ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, স্যার,' আস্তে আস্তে বলল রানা। 'সুযোগ পেলে চোর চুরি করবেই। চোর ঠেকাতে হলে গৃহস্থকে ঘরের দরজা-জানালা নিরাপদ করতে হয়, আমরা কখনোই তা করিনি। এই জন্যেই দিনে দিনে সাহস বেড়েছে ওদের।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন জেনারেল। 'সেই জন্যেই তো দুঃখ হয়।'

'খবরটা কি পত্রিকাওয়ালারা জেনেছে, স্যার?'

'না, ওরা এখনও টের পায়নি কিছু।' পাইপ ধরালেন তিনি নতুন তামাক ভরে। 'আফগানরাও শুনলাম এ ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি আরোপ করেছে।'

'কোথায় রাখা হয়েছে ওদের?'

'কাবুলেই। তাশকুরগান জেলে।' সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকালেন। 'তোমাকে যেতে হবে, রানা। যেভাবে পার ওদের দু'জনকে বের করে আনতে হবে জেল থেকে। কারেমি কি দিয়েছে ওদের, জানতে চাই আমরা।'

'কিন্তু, স্যার, ওটা আছে কি না...'

'আমার বিশ্বাস আছে,' চোখের কোণ চুলকালেন তিনি। 'আমাদের লোক বলছে সেই রাতে কারেমি যখন ডনের হোটেলে যায়, তখন তার হাতে একটা পোর্ট ফোলিও ছিল। বেরিয়ে আসার সময় ছিল না। তার মানে ওটা ডনকে দিয়েছে সে। অথচ কর্নেল মুরাদ এখনও কাগজগুলো পায়নি, কেন? এর একটাই জবাব, সাংবাদিক যুগল বিপদ টের পেয়ে কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে। হয়তো ওদের সঙ্গে নেই, আর কোথাও আছে। তবে আছে যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওগুলো পেয়ে গেলে এতদিন ওদের বাঁচিয়ে রাখত না কর্নেল।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা।

'আমি তাশকুরগান সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি। খুব একটা সুবিধের মনে হয়নি। ওখানে কিছু ঘটাতে গেলে বড় ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে।'

'জ্বি।'

'আমেরিকানদের সাথে যোগাযোগ করেছি আমি। ওরা ওদের স্যাটেলাইটের তোলা কাবুলের কিছু ছবি দিয়েছে। ওতে তাশকুরগানসহ চারদিকের অনেকটা এলাকা একদম পরিষ্কার দেখা যায়। তোমাদের কাজে লাগবে ওগুলো।'

তাশকুরগান, কাবুল।

অগভীর, দুঃস্বপ্নময় ঘুম ভাঙতে চোখ মেলল ডন। সেলের বাইরে হল্লা করছে রেগুলার ও তালেবান গার্ডরা। মাতৃভাষায় কয়েদীদের চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করছে। রাতের চার-পাঁচ ঘণ্টা বাদে এইই চলে এখানে সারাক্ষণ। আজ পাঁচদিন হলো এখানে আছে সে, কান সয়ে গেছে।

ক'টা বাজে এখন? ঘড়ি নেই, খুলে নিয়ে গেছে গার্ডরা, তাই

সঠিক সময় বোঝার উপায় নেই। তবে সিলিঙের কাছাকাছি সেলের তিন বাই এক ফোকর দিয়ে যে অ্যাঙ্গেলে সূর্যের আলো আসছে, তাতে মনে হয় তিনটের মত বাজে।

উঠে বসল ডন খড়ের বিছানার ওপর। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে বিছানা। প্রথম দু'দিন অস্বস্তি লেগেছে, এখন আর লাগে না। ওকে আলাদা রেখেছে কর্নেল মুরাদ। আট বাই আট পাথরের সেলে একা আছে ডন, দেয়াল ধূসর, মেঝে ধূসর, সিলিঙ ধূসর, লোহার গেটও ধূসর। স্টীল শীট দিয়ে ঢাকা, বাইরের কিছু দেখার উপায় নেই। বিশেষ সেলের জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা।

তাশকুরগানে বিকেল পাঁচটা হচ্ছে বিপজ্জনক সময়। তালেবান সরকারের বিচারমন্ত্রী হোসেন শাহ বরকতী রোজ একবার করে টহলে আসে তখন। লোকটার চেহারা অনেকটা পাকিস্তানী জেনারেল টিক্কা খানের মত। সালোয়ার-কুর্তা, পাগড়ি আর গালভরা কুচকুচে দাড়িতে চট্ করে বোঝা যায় না অবশ্য। তার শূন্য দৃষ্টি দেখলে বুক কাঁপে ডনের।

এ-সেল ও-সেলে ঘোরাঘুরি করে ব্যাটা। মজা দেখার জন্যে 'তোমার ঝামেলা আজ মিটিয়ে দিলাম, বন্ধু। রায়ে সই করে দিয়ে এসেছি। কাল তুমি খতম!' অথবা 'আজ রাতে শেষ খানা খাবে তুমি।' নয়তো, 'আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিয়ো রাতের নামাজের সময়,' ইত্যাদি বলে কয়েদীদের ভয় দেখায়।

যাদের বলা, তাদের চেহারার পরিবর্তন দেখে মিটিমিটি হাসে বরকতী, কিন্তু চোখ পর্যন্ত পৌঁছায় না তা। দু'বার ডনের সেলেও এসেছে লোকটা, একই ধরনের ভয় দেখানো মন্তব্য করেছে হাসতে হাসতে। লোকটার কথা মনে এলে বুক কাঁপে ওর। তবে সে যে কেবল ভয়ই দেখায়, তা নয়। কাজ করেও দেখায়। তাশকুরগান জেলখানার ধারণ ক্ষমতা মাত্র আটশো, সেখানে এই

মুহূর্তে কয়েদী আছে কম করেও তিন হাজার।

তারওপর রোজই ডজন ডজন কয়েদী আসছে। পরিস্থিতি যাতে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বাইরে চলে না যায়, সেজন্যে রোজ কম করেও এক-দেড় ঘণ্টা শূটিং প্র্যাকটিসও চলে ভেতরের ফায়ারিং স্কোয়াডে।

কাজেই বরকতী কারও কারও সঙ্গে ঠাট্টা করলেও তারা ব্যাপারটাকে সত্যি বলেই ধরে নেয়। কেঁদেকেটে একাকার হয়। তাই দেখে মজা পায় সে।

নাকে কেমন এক গন্ধ আসতে ঘুরে তাকাল সাংবাদিক। খড়ের গদির কাছে পড়ে আছে ওর দুপুরের বরাদ্দ এক বাটি পানির মত বাঁধাকপির সুপ। খায়নি। প্রথমদিন ওই জিনিস পেটে যাওয়ামাত্র যে ভয়ঙ্কর ডায়রিয়া শুরু হয়েছিল, তারপর থেকে আর তাকিয়েও দেখেনি ও বাটির দিকে। হাত দিয়ে ঠেলে ওটা আরও সরিয়ে দিল সে। যূথীর কথা ভাবতে লাগল।

কোথায় আছে ও, কেমন আছে, কিছুই জানে না ডন। এয়ারপোর্ট থেকে এখানে আসা পর্যন্ত একসঙ্গে ছিল ওরা সেদিন, তারপর আলাদা করে ফেলা হয়েছে। রোজই আশা করে আজ হয়তো দেখা হবে দু'জনের, কিন্তু না। পাঁচদিন চলে গেল, কোন খবর নেই।

হাত দিয়ে বিছানার ওপর চরে বেড়ানো কয়েকটা তেলাপোকা তাড়িয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে কাত হয়ে শুলো ডন। ভাগ্যে কি আছে ভাবতে ভাবতে অগভীর, অস্বস্তিকর তন্দ্রার রাজ্যে তলিয়ে গিয়েছিল, আচমকা ঘটাং শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল। হোসেন শাহ বরকতীকে হাসিমুখে ঢুকতে দেখে ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে উঠল। বরকতীর দু'পাশে সেই দুই তালেবান গার্ড, আলি ও ইরাজ।

ধীরস্থির ভঙ্গিতে সেলের চারদিকে নজর বোলাল বিচারমন্ত্রী, নাক কোঁচকাল। হাসি গায়েব হয়ে গেছে। 'অ্যাহ্, কী বাজে দুর্গন্ধ! মনে হচ্ছে আমাদের বিশেষ ব্যবস্থা পছন্দ করছে না বাংলাদেশী সাংবাদিক বন্ধু। কিন্তু করা উচিত। প্রত্যেকটা সেলে আট থেকে দশজন করে আসামী রেখেছি আমরা, শুধু আপনাদের দু'জনকে আলাদা রেখেছি। সাধারণ কয়েদীর মত আচরণ করছি না আপনাদের সাথে।'

মুহূর্তে বুকের চাপ হাল্কা হয়ে গেল ডনের। এই প্রথমবারের মত ওর সামনে যূথীর প্রসঙ্গ তুলল কেউ। ও বেঁচে আছে, এখানেই আছে, ভেবে মনের বল বহুগুণ বেড়ে গেল।

'সে জন্যে অবশ্য অ্যাকোমোডেশনের সমস্যায় পড়েছি আমরা,' বলে উঠল বরকতী। 'তাই ঠিক করেছি খুব শিগ্‌গিরি ঝামেলা মিটিয়ে ফেলব।' হাসি ফিরে এল মুখে। তর্জনী দিয়ে ট্রিগার টানার ভঙ্গি করল। 'গুড়ুম, গুড়ুম! মামলা খতম। দুটো সেল বাড়বে।'

গলা শুকিয়ে উঠল ডনের। কিন্তু মনের ভাব বরকতীকে টের পেতে দিতে রাজি নয় বলে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল। 'আমরা কোন অন্যায় করিনি, কেন অনর্থক আমাদের...'

'আলবৎ করেছ!' খ্যাক খ্যাক করে হাসল মন্ত্রী। 'এবং সেটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। নইলে স্পাইদের সাথে কি আচরণ করতে হয়, আমরা তা ভালই জানি।'

'আমি স্পাই নই!'

ফের উধাও হয়ে গেল বরকতীর হাসি। 'কর্নেল মুরাদ সে ব্যাপারে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গতকালই জানিয়েছে আমাকে। কোন সন্দেহ নেই তুমি এবং তোমার স্ত্রী, দু'জনেই স্পাই। এখন আসল প্রশ্ন হচ্ছে তোমরা মরতে চাও, না বাঁচতে। কোনটা?'

কিছুক্ষণ লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ডন। 'আমি কোন অন্যায় করিনি, কাজেই মরতে চাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।'

'গুড!' ঢলঢলে কুর্তার সাইড পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল সে। 'তাহলে এই স্বীকারোক্তিনামায় সই করো।'

ওটা দেখেও না দেখার ভান করল সে। 'আমার কোন অপরাধ প্রমাণ হলো না, কোন বিচার হলো না, কিসের স্বীকারোক্তিতে সই করব আমি?'

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বিচারমন্ত্রী, মাথা দোলাল ডানে-বাঁয়ে। 'নিজেই যখন সেধে মরতে চাইছ, আমার আর কি করার আছে, বলো?' একটু বিরতি দিয়ে বলল, 'যাই, দেখি তোমার স্ত্রী কি বলে।'

এক ফ্লোর নিচে একই রকম আরেক সেলে আছে যূথী। অনেক ভাল আছে সে ডনের তুলনায়, রীতিমত গার্ডদের খাতিরযত্নে আছে। একে মেয়ে, তারওপর সুন্দরী ও অল্প বয়সী। সেই সঙ্গে আছে পুরুষ পটানোর সহজাত ক্ষমতা। সব অস্ত্র একসঙ্গে প্রয়োগ করে প্রথমদিনেই নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছে যূথী।

বন্দী হয়েও মুখের হাসি মলিন হতে দেয়নি। ওর সেলের পাহারায় যারা রয়েছে; আলি আর ইরাজ, ওদের দেখলে জোর করে হলেও মিষ্টি হাসি দেয়। ভাঙা ভাঙা পশতুতে ওদের, ওদের পরিবারের অন্যদের কুশল জিজ্ঞেস করে। সুযোগ পেলে যেন খেয়াল করেনি, এমনি 'অসতর্কভাবে' কাটাছেঁড়া শার্টের তলায় ঢাকা ওর দুধসাদা বুকের খানিকটা, কি উরুর কিছু অংশ দেখতে

সাহায্য করে।

না দেখেও আলি-ইরাজের হাঁ করে তাকিয়ে থাকা বা ঢোক গেলা দিব্যচোখে ঠিকই দেখতে পায় যূথী।

এসব ও করছে একটামাত্র কারণে, তা হলো এখান থেকে ফিলমটা নিয়ে বের হওয়ার কোনও উপায় করা। গার্ড দুটো যে এখন ধর্ম-কর্ম, বেহেশত্-দোজখ ভুলে কেবল ওকে পাওয়ার অলীক স্বপ্নে বিভোর, তাতে যূথীর কোন সন্দেহ নেই। এখন ওদের মধ্যে নীরব প্রতিযোগিতা চলছে কে আগে ওকে দখল করবে, তাই নিয়ে।

এ ওকে লুকিয়ে চা-কফি দিয়ে যায়, ও একে আড়াল করে ওর প্লেটে ভাল ভাল খাবার তুলে দিয়ে যায়। ভালই আছে যূথী। আমেরিকান মাসকারা, লিপস্টিক, আয়না-চিরুনি, মোটামুটি সবই জুটে গেছে। ডন বেঁচে আছে, এই জেলেই আছে, তাও আর অজানা নেই।

কাজেই খুব একটা পরোয়া নেই ওর। মৃত্যু যদি হয়, যখন হওয়ার হবে। তা নিয়ে ভাবতে গিয়ে আগেই নিজেকে মেরে ফেলতে রাজি নয়। এ মুহূর্তে দেয়ালে হেলান দিয়ে পাঁচদিন আগের কথা ভাবছে মেয়েটি।

রাশিদ কারেমি বিদেয় নেয়ার পরই ডনের সন্দেহ জেগেছিল তাকে হয়তো অনুসরণ করছে তালেবানরা। যদি তাই হয়, তাহলে ওদের পর্যন্ত পৌঁছতে ব্যাটাদের মোটেই সময় লাগবে না। কাজেই পরের করণীয় ঠিক করতে দু'মিনিটও নষ্ট করেনি সে, যূথীর মিনিয়েচার মিনক্স এলএক্স ক্যামেরা দিয়ে ডকুমেন্টগুলোর ছবি তুলে নিয়েছে ঝট্পট্। ফ্ল্যাশের আলো যাতে বাইরে না যায়, সে জন্যে জানালাবিহীন বাথরুমে কাজ সেরেছে। কাজ শেষে আধইঞ্চি প্লাস্টিক স্পূল ক্যাসেটটা সেলোটেপ দিয়ে আটকে দিয়েছে যূথীর

ঘাড় ও খুলির সংযোগে, ঘন চুলের নিচে।

এখনও ওখানেই আছে। যূথী জানে, ও যদি আরও কিছুদিন ওর বক্তব্যে অটল থাকতে পারে, যদি মুখ না খোলে, তাহলে নিশ্চয়ই ছাড়া পাবে। এ দেশে বিদেশীদের মৃত্যুদণ্ড হয় না তা নয়, হয়, তবে অভিযোগ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নয়। যূথী অন্তত তেমন কোন ঘটনার কথা শোনেনি। যদি তেমন কোন অঘটন না ঘটে, একদিন এই ফিলম্ নিয়ে ওরা দেশে ফিরবেই। সব হারামজাদাকে…করিডরে ব্যস্ত, ভারী পায়ের আওয়াজ উঠতে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল যূথীর।

সেলের তালা খুলল নতুন এক গার্ড। একে আগে কখনও দেখেনি ও। ভেতরে ঢুকেই একটা মেশিন পিস্তল তুলল লোকটা, চেহারা রাগে লাল। তার চোখে খুনীর চাউনি দেখে ভয় পেয়ে গেল যূথী, দেয়ালের মধ্যে ঢুকে নেই হয়ে যেতে চাইল।

'তুমি মিথ্যে বলেছ আমাদের!' চেঁচিয়ে উঠল গার্ড। 'অনর্থক সময় নষ্ট করেছ আমাদের, তাই মরতে হবে আজ তোমাকে!'

ওর ডান হাত মুচড়ে পিছনে নিয়ে এল লোকটা, কব্জি যথাসম্ভব ওপরে তুলে সামনে ঠেলে নিয়ে চলল। 'হাঁটো! এখনই মরবে তুমি!'

ব্যথায় চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল যূথীর। গুঁতো খেয়ে পা বাড়াতে বাধ্য হলো। করিডরে এসে আলি বা ইরাজের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল ও—নেই কেউ। একদম ফাঁকা করিডর। পথের দুপাশের অসংখ্য সেলে মানুষ গিজগিজ করছে। ফ্যাল ফ্যাল করে ওদের দেখছে সবাই।

কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে করল যূথী গার্ডের নির্দেশে, তারপর আচমকা বেরিয়ে এল অন্ধকার খোলা আকাশের নিচে। ঠাণ্ডা বাতাসে শিউরে উঠল। তাশকুরগানের পিছনের কোর্টইয়ার্ড

এটা–ফায়ারিঙ স্কোয়াডের নির্দিষ্ট জায়গা।

অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা আধ ডজন তালেবান বিপ্লবী গার্ড দেখে আত্মা উড়ে গেল যূথীর। তবে কি সত্যিই…!? চোখ আপনাআপনি এনক্লোজারের দিকে চলে গেল। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা কে একজন দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। দু'হাত পিছনে বাঁধা। তার পাশে আরেকজন আছে–হাসছে মিটিমিটি।

হোসেন শাহ্ বরকতী!

কিন্তু ওটা কে, ডন? হাতে ঢিল পড়ল যূথীর, দু'হাত এক করে বেঁধে ফেলা হলো পিছনে। পরক্ষণে কালো কাপড়ের স্যাকে ঢাকা পড়ে গেল গলা পর্যন্ত। সরু পাটের দড়ি দিয়ে ওটার মুখ বেঁধে দেয়া হলো। তীব্র আতঙ্কে ডনের নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল ও, কিন্তু আওয়াজ বের হলো না।

একজোড়া কঠিন হাত ঠেলে আরও খানিকটা নিয়ে গেল ওকে, দাঁড় করিয়ে দিল। খুব সম্ভব ডনের পাশে। পশতু কমান্ড শুনল যূথী, রাইফেল কক্ করার শব্দ শুনল। সব এত দ্রুত ঘটে গেল যে বিশ্বাস করতে কেমন বাধো বাধো ঠেকল। পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল হঠাৎ, হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, পড়ে যাচ্ছে যূথী, তখনই স্বর ফুটল।

একই সময় গুলি করার নির্দেশ দেয়া হলো। দুনিয়া কাঁপানো বজ্রপাতের মত একযোগে গর্জে উঠল ছয়টা রাইফেল। প্রায় বদ্ধ এনক্লোজারে এত জোর আওয়াজ উঠল যে ক্ষণিকের জন্যে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলল যূথী, বধির হয়ে গেল।

কারাগার ভবনের এ পাশের এক জানালায় দাঁড়িয়ে নিচের দৃশ্য দেখছিল কর্নেল মুরাদ, গুলির শব্দ শুনে পর্দা ফেলে পিছিয়ে গেল সে। ধীরগতিতে ঘূর্ণায়মান সিলিঙ ফ্যানের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। রেটিনায় এখনও ভাসছে বাইরের ছবি।

ওটা সত্যি নয়, মক এগজিকিউশন। ত্যাড়া কিসিমের অপরাধীদের দোষ কবুল করাবার জন্যে মাঝেমধ্যে এমন আয়োজন করতে হয়।

ফল মন্দ হয় না। এখন দেখা যাক, ভাবল সে, এরা মুখ খোলে কি না।

খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম। চারদিন পরের কথা।

দুর্গম পাহাড়ের ওপর তাড়াহুড়ো করে তৈরি এক ঘরে জরুরী বৈঠক চলছে। ঘরটা কাঠের, গোলপাতার ছাউনি। মাসুদ রানাসহ বারোজন রয়েছে ভেতরে। সবার বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যে। বেশিরভাগ বাংলাদেশ আর্মির অবসরপ্রাপ্ত কমান্ডো, অন্যরা বিসিআই ও রানা এজেন্সির।

তিনজন বাদে আর সবাই বর্তমানে এই দুই সংস্থার হয়ে বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। আর্জেন্ট কল পেয়ে ঢাকা হয়ে গতকাল এখানে পৌঁছেছে। তিনজন দেশে ছিল, এরা বিসিআই হেড অফিসের 'রিজার্ভ'। রানা তাদের নিয়ে চলে এসেছে আগেই।

তাশকুরগান জেলে হানা দিতে যাচ্ছে ওরা সবাই মিলে। অপারেশনের নাম রাখা হয়েছে 'থান্ডারবোল্ট'।

'এই হচ্ছে পরিস্থিতি,' বিস্তারিত ব্যাখ্যা শেষে বলল টীম লীডার মাসুদ রানা। দুই সারিতে বসা এগারো জোড়া অপলক চোখের ওপর দিয়ে ঘুরে এল ওর দৃষ্টি। সব ক'টা মুখ যেন পাথরে তৈরি, চোখ কাঁচের। অটল অভিব্যক্তি, পলক পর্যন্ত ফেলছে না কেউ।

'কাজ কঠিন, সন্দেহ নেই। তবে অসম্ভব নয়। আমাদের যেতে হবে, তাশকুরগান জেল ভেঙে সাংবাদিক ডন ও তার স্ত্রীকে বের করে সটকে পড়তে হবে, তালেবান মোল্লার দল ব্যাপার টের

পাওয়ার আগেই।'

ঘুরে পিছনের দেয়ালে ঝোলানো আফগানিস্তানের বড় এক ম্যাপে হাতের ছড়ি দিয়ে টোকা দিল ও আস্তে করে। 'এই হচ্ছে সেই দেশ, আর এখানে কাবুল। অনেক বড় দেশ, পাঁচটা বাংলাদেশের সমান। তবে বেশিরভাগই মরুভূমি। দেশ, আবহাওয়া এবং প্রকৃতি, সবই আমাদের জন্যে বৈরী। যে সমস্ত পথ আমাদের ব্যবহার করতে হবে, তা কেবল কল্পনায় আছে, বাস্তবে নেই।' অডিয়েন্সের দিকে ফিরল ও।

'গেলাম আর ছেলের হাতের মোয়া কেড়ে নিয়ে চলে এলাম, এমনটা যদি কেউ ভেবে থাকেন, দূর করে দিন মন থেকে। কারণ তা হওয়ার নয়। পাঠানরা যোদ্ধা জাতি, কথাটা সেকেন্ডের জন্যেও ভুলবেন না। আফগানরা অজেয়, কেউ আজ পর্যন্ত হার মানাতে পারেনি ওদের। চেঙ্গিস খান পারেনি, ইংরেজরা পারেনি, সোভিয়েত ইউনিয়নও পারেনি।

'রুশদের ভাগিয়েছে মোজাহেদিনরা, আর মোজাহেদিনদের ভাগিয়েছে তালেবানরা। ধর্মান্ধ হোক আর যা-ই হোক, লড়তে জানে ওরা সবাই। কাজেই ওদের আন্ডারএস্টিমেট করার কোন উপায় নেই। তবে ও দেশে একটা সুবিধে হয়তো পাব আমরা। সেটা হচ্ছে প্রায় অসামরিক তালেবান গার্ডদের সবকিছুতে সার্বক্ষণিক নাক গলানো নিয়ে রেগুলার ফোর্স বেশ বিরক্ত। দ্বন্দ্ব আছে ওদের ভেতরে। এর ফলে দ্রুত কাজ সারার হয়তো সুবিধে হবে আমাদের।

'একটা কথা মনে রাখবেন, এই মিশনে আমি কোন হিরো চাই না। কোন হারকিউলিস চাই না। আমার নির্দেশ ছাড়া কেউ এক কদমও ফেলবে না ও দেশে, অন্ধের মত আমার প্রত্যেকটা নির্দেশ অনুসরণ করবে, এমন অনুগত যোদ্ধা চাই। নইলে হয়তো কেঁচে

যাবে সব, ছি ছি করবে সবাই বাংলাদেশকে।'

হাত তুলল এক কমান্ডো। 'একটা প্রশ্ন।'

'বলুন,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'এই দুই সাংবাদিক এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? তাদের উদ্ধার করতে এতবড় ঝুঁকি কেন নিচ্ছি আমরা?'

'এর সাথে দেশের স্বার্থ গভীরভাবে জড়িয়ে আছে, তাই নিচ্ছি,' ছড়ি সামনের টেবিলে রেখে সিধে হলো ও। 'কি স্বার্থ, তা ভালয় ভালয় ফিরে আসতে পারলে জানতে পাবেন সবাই, আজ নয়। তাছাড়া মিশন শুরুর সময় ভেতরের খবর যত কম জানা থাকবে, ততই লাভ। ওখানে কেউ ধরা পড়ে গেলে নির্যাতনের মুখে হয়তো ফাঁস করে দিতে পারে সে সব কথা। অজানা থাকলে সে ভয় থাকে না।'

বলা শেষ করে অন্যদের দেখল ও পালা করে। 'আর কোন প্রশ্ন?'

'আমরা কবে যাচ্ছি, স্যার?' বলল খাটোমত একজন। পিছনের সারিতে বসা সে, সামনের দুই দশাসইর জন্যে এতক্ষণ তাকে দেখাই যাচ্ছিল না।

'পাঁচদিন পর। প্ল্যানিঙের কিছু কিছু অংশ এখনও বাকি আছে। ওগুলো শেষ হলেই যাত্রা করব।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল কমান্ডোদের মধ্যে। ওদের দু'মিনিট সময় দিয়ে আবার মুখ খুলল রানা। 'এবার অন্য প্রসঙ্গ। আমরা সবাই সবাইকে মোটামুটি চিনি, জানি। কিন্তু একসঙ্গে একই মিশনে কাজ করতে যাচ্ছি এই প্রথম, কাজেই আসুন, আরেকবার নতুন করে সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত হই। জাস্ট ফরমালিটি। আমি মাসুদ রানা, টীম লীডার।'

প্রথম সারির বাঁ দিকের ছয় ফুটী দানবের দিকে তাকাল ও।

বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। 'করপোরাল সদরউদ্দিন, স্যার।'

'মিশন কোয়ালিফিকেশন?' কেউ একজন পিছন থেকে প্রশ্ন করল।

'ট্রুপার।'

সে বসে পড়তে পরেরজন উঠল। ছোটখাট, হাসিখুশি মানুষ। সারাক্ষণ হাসি লেগেই আছে মুখে। 'আলালউদ্দিন খান পাঠান। কমিউ...'

'তালেবান না তো?' কে যেন বলল চাপা গলায়। মৃদু হাসি ফুটল সবার মুখে। হাসি আড়াল করতে নাকের নিচটা চুলকাল রানা। মাথা ঝাঁকাল তার উদ্দেশে, 'কথা শেষ করুন।'

'কমিউনিকেশনস। টাইগার নামে পরিচিত ছিলাম চাকরিতে।'

'সীট ডাউন, পুসি ক্যাট,' আরেকজন মন্তব্য করল।

তার পাশেরজনকে দেখল রানা। এ আরও ছোটখাট। যা উচ্চতা, তাতে আর্মিতে ভর্তি হতে পারার কথা নয় মানুষটার। কিন্তু তবু যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতার জন্যে কমান্ডো বাহিনীতে জায়গা পেয়েছে। ড্রাইভিঙে মহাওস্তাদ। আনআর্মড কমব্যাটে তুলনাহীন।

'ট্রুপার হেকমত আলি, স্যার। ড্রাইভার,' বলে বসে পড়ল সে।

পরের দু'জন দুই সার্জেন্ট। দু'জনেই এক্সপার্ট 'কপ্টার পাইলট। মো. শহীদ ও জাফর আহমদ। বিশেষ যোগ্যতা: তিন-চারটে ভাষার সাথে পশুতুতেও অনর্গল কথা বলতে পারে দু'জনেই।

পরের সারির প্রথমজন আরেক এক্সপার্ট ড্রাইভার, ফয়েজ মোহাম্মদ, করপোরাল। লোকটা বিশালদেহী, যেমন লম্বায়, তেমনি পাশে। এরপর উঠল এক লম্বা, তালপাতার সেপাই। প্রেসিডেন্টের

গার্ড রেজিমেন্টের সদস্য ছিল সে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত, নাম খন্দকার জাহাঙ্গীর। তার আগের চাকরি জীবনে সিনিয়র নার্স ছিল, বিভিন্ন আর্মি হসপিটালেও কাজ করেছে। মোটামুটি ডাক্তারী জানে।

এরপর ক্যাপ্টেন কামাল ও তার তিন সঙ্গী। সার্জেন্ট হুমায়ুন আহমদ, এবং দুই করপোরাল–আহসান হাবিব ও মইনুল হোসেন। এরা প্রত্যেকে গেরিলা ফাইটার। ক্যাপ্টেন আর সার্জেন্টের অতিরিক্ত যোগ্যতা, আন্ডারওয়াটার অপারেশনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তারা।

'অলরাইট, জেন্টলমেন,' পরিচিতি পর্ব শেষ হতে রানা বলল। 'পরস্পরকে চেনার সুযোগ পরে আরও পাচ্ছি আমরা। এখন থেকে মিশন শুরু না হওয়া পর্যন্ত প্রি-অপ কনফাইনমেন্টে থাকবেন আপনারা।

'আমাদের বারোজনের দলটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছি আমি। আমি, পাইলট শহীদ আর জাফর, এবং আলালউদ্দিন থাকছি জেলখানায় হামলা করে সাংবাদিক যুগলকে বের করে আনার দায়িত্বে। এই দলে আমরা তিনজন পশতু জানি মোটামুটি, সময়মত ভাষাটা কাজে লাগবে ওখানে।'

আসল দলে থাকতে পারছে না জেনে অবশিষ্ট আটজনের চেহারায় খানিকটা হতাশা ফুটল। অন্য তিনজন খুশি, পরস্পরের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল তারা।

'করপোরাল সদরউদ্দিন ডাক্তার খন্দকার জাহাঙ্গীর এবং ফয়েজ ও বরকতকে নিয়ে ব্যাক-আপ টীমের নেতৃত্বে থাকবে। যদি জিম্মিরা অসুস্থ থাকে, ওরা তাদের দেখাশুনো করবে ফিরতি পথে। দুই ড্রাইভার, আলাল আর ফয়েজ মোহাম্মদের কাজ হবে মিশন শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসা। আর যদি এক আধটা কপ্টার দখলের সুযোগ

পাওয়া যায়, দুই পাইলট তখন কাজে আসবে।

'ক্যাপ্টেন কামাল এবং তার দলের সদস্যদের সঙ্গে নেয়ার কারণ হচ্ছে, হয়তো শেষ সময়ে বিকল্প এস্কেপ রুট, সাগর হয়ে পালাতে হতে পারে আমাদের। তখন তাদের সাহায্য দরকার হবে।

'কাল থেকে শুরু হবে আমাদের আসল প্রস্তুতি। অস্ত্র প্রশিক্ষণ কোর্স, আন-আর্মড কমব্যাটের ব্রাশ-আপ কোর্স, ড্রাইভিং ইত্যাদি। সবশেষে মক-আপ ট্রেনিং। তাশকুরগান জেলখানার মডেল তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আশা করছি পরশু কমপ্লিট হবে ওটা।'

উঠে পড়ল মাসুদ রানা। 'ওয়েল, জেন্টলমেন, দ্যাট'স অল। কাল ভোর চারটায় প্যারেড গ্রাউন্ডে দেখা হবে। নাস্তার আগে পাঁচ মাইল ধীরগতির দৌড়ের মধ্যে দিয়ে শুরু হবে আমাদের আসল অধ্যায়।'

'অপারেশন থান্ডারবোল্ট' টীমের প্রথম ব্রীফিং শেষ হলো।

পরের চারদিন আর্মি এঞ্জিনিয়ারিং কোরের সদস্যদের ছবি দেখে তৈরি হুবহু নকল তাশকুরগানকে ঘিরে একটানা ক্লোজ মক-আপ কমব্যাট ট্রেনিং চলল রানার নেতৃত্বে। অনেক দূর দিয়ে পুরো এলাকা কর্ডন করে রাখল আর্মি, গ্রামবাসী কাছে ঘেঁষতে পারল না। দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দলটার অনুশীলন দেখল তারা। উঁচু নিচু পাহাড়ী পথে-বেপথে মরুভূমির ক্যামোফ্লেজ রঙা দুটো ল্যান্ড রোভারের পাগলের মত ছোটাছুটি দেখল।

পঞ্চম দিন ভোরে আরও অবাক হলো তারা কর্ডন নেই দেখে। কেউ নেই সেখানে, কিচ্ছু নেই। সব হাওয়া হয়ে গেছে।

চিরুনি থেমে গেল হামিদা গুলিস্তানীর। সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী সে।

চমৎকার পটলচেরা চোখ। হাসিতে মুক্তো ঝরে। ঘুরে তাকাল ভাইয়ের দিকে। 'কি বললে, ওদের সরিয়ে ফেলা হবে?'

মাথা ঝাঁকাল দাউদ। সতেরোর মত বয়স তার, থুত্‌নিতে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা দাড়ি। তালেবান গার্ড বাহিনীর সদস্য। 'হ্যাঁ। তাই তো শুনছি।'

'কোথায় নিয়ে যাবে?'

'বাঘলান।'

ঘুরে আবার আয়নায় নজর দিল হামিদা। জিভের ডগায় আরও অসংখ্য প্রশ্ন ঠেলাঠেলি করছে, কিন্তু মুখ খুলতে সাহস হলো না। সন্দেহ করে বসতে পারে দাউদ। বড় ইঁচড়ে পাকা ছেলে। হামিদাকে তো পাত্তা দেয়ই না, বড়বোন ফাহমিদাকে পর্যন্ত না। দ্বিগুণ বয়সী ফাহমিদার সাথেও সুযোগ পেলেই সমানে মুখ নাড়ে।

ওই দুই সাংবাদিকের বিষয়টা নিয়েও ইদানীং খুবই বাড়াবাড়ি করছে। ও জানে হামিদা বাংলাদেশ দূতাবাসে কাজ করে, তাই সুযোগ পেলেই তাই নিয়ে খোঁচায় ওকে। যেন দুই বাংলাদেশী অপরাধ করলে সে-ও অপরাধী হয়ে গেল, এমন ভাব করে। ওই ব্যাপারে নাকি লজ্জায় বন্ধুদের সামনে মুখ দেখাতে পারে না দাউদ।

শুনে গা জ্বলে গেছে হামিদার। জবাবে বলেছে, যে সেয়ানা ভাই বোনের রোজগারের অন্ন ধ্বংস করে, তার আবার লজ্জা আছে নাকি?

তাতেও শিক্ষা হয়নি। মুচকি মুচকি হাসে আর খোঁচাখুঁচি করে।

চুল বাঁধা শেষ করে বড় একটা চাদর গায়ে-মাথায় জড়াল হামিদা। 'কবে সরাচ্ছে ওদের?' যেন গুরুত্ব নেই, জবাব দিলে চলে, না দিলেও চলে, এমন ভাবে করল প্রশ্নটা।

'শুনেছি কাল-পরশুর মধ্যে।' দুষ্টামির হাসি ফুটল দাউদের মুখে। 'এত প্রশ্ন করছ কেন, বয়ফ্রেন্ডকে জানাতে হবে?'

রেগে উঠল মেয়েটি। বাংলাদেশ দূতাবাসে জালাল নামে নতুন একটা স্টাফ এসেছে পাকিস্তান থেকে 'বদলি' হয়ে। বেচারা নতুন, কিছু চেনে না কাবুলের, তাই দুদিন তাকে নিয়ে মার্কেটে গিয়েছিল ও। একদিন কিছু সময়ের জন্যে পার্কেও বসেছিল, দূর থেকে দেখে ফেলে দাউদ। ব্যস্, সেদিন থেকে সুযোগ পেলেই তাকে নিয়ে বিরক্ত করে আসছে ওকে।

ঠাণ্ডা গলায় বলল হামিদা, 'তোমাকে অনেকবার বলেছি ও আমার বয়ফ্রেন্ড নয়, দাউদ। এক কথা বারবার শুনতে ভাল্লাগে না।'

মিথ্যে বলল-ও। আসলে ভাল লাগে। ওরকম এক স্মার্ট ছেলে-বন্ধু তার আছে, ভাবলেই অদ্ভুত এক শিহরণ জাগে দেহমনে। ছেলেটা বিদেশী, পশতু অল্প বোঝে, এই যা। নইলে যে কোন আফগান যুবকের থেকে হাজারগুণে ভাল। কি ভেবে আরক্ত হলো হামিদা গুলিস্তানী। নিজের দুর্বলতার কথা ভালই জানে। প্রথম প্রথম জলিলের চোখে চোখ রেখে নির্দ্বিধায় কথা বলতে পারত ও, ইদানীং পারে না। কেন যেন আপনা থেকেই নত হয়ে যায় দৃষ্টি। কেন? হামিদা দুর্বল হয়ে পড়ছে? দাউদ সেদিন প্রথম হাসতে হাসতে ওকে তার বয়ফ্রেন্ড বলেছিল, সেদিন থেকেই এই পরিবর্তন এসেছে ওর মধ্যে। এর মানে কি? ও নিজেও কি মনে মনে…?

হাতব্যাগ তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল হামিদা। কাজে যেতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে। 'আম্মা, আমি যাচ্ছি!'

তিন

জিয়া আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট।

বিশাল হ্যাঙ্গারের একেবারে ভেতরদিকে দাঁড়িয়ে আছে এক আমেরিকান ট্রান্সপোর্ট বিমান, হারকিউলিস সি-১৩০। তিনদিন আগে গভীর রাতে এসেছে ওটা, এসেই যে নাক সেঁধিয়েছে হ্যাঙ্গারে, আর বের হওয়ার নাম নেই।

গত তিনদিন ধরে হ্যাঙ্গার ঘিরে রেখেছে একদল মানুষ। সাদা পোশাকে আছে তারা, কিন্তু চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সাধারণ নয়। গ্রাউন্ড ক্রুদের ধারণা ওরা আর্মি। বিশেষ পাস না থাকলে হ্যাঙ্গারে লাট-বেলাট কাউকেই ঢুকতে দিচ্ছে না লোকগুলো। কাছেই ঘেঁষতে দেয় না।

বিমানের হাতে গোনা কয়েকজন গ্রাউন্ড ক্রু আর টেকনিশিয়ান জানে ভেতরে কি চলছে। আর্মিদের কাজে সাহায্য করছে বলে জানে তারা। কাজ বলতে মূল ছিল বিমানটার সমস্ত মার্কিং মাস্কিং টেপ দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে রং স্প্রে করাসহ টুকটাক কিছু টেকনিক্যাল জব। সে সব শেষ, ওটা এখন টেক্-অফের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি। ভাসা ভাসা শোনা যাচ্ছে সন্ধের পর যাত্রা করবে হারকিউলিস। কোথায়, আল্লা মালুম।

ওটা সম্পর্কে এত রাখ-ঢাক কেন, সে ব্যাপারে পরিষ্কার কিছু জানা যাচ্ছে না বলে বন্দরের সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে নানা

জল্পনা-কল্পনা চলছে। চারদিকে গুজগুজ ফিসফিস।

সন্ধের পর সত্যি ডানা মেলল হারকিউলিস, আরও অজস্র গুজবের জন্ম দিয়ে পতেঙ্গা এয়ারপোর্টের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল।

চট্টগ্রাম।

শহরতলির এক বাড়ির ড্রইং রূমে বসে আছে স্তম্ভিত মাসুদ রানা। মিশনের অন্য এগারোজনের অবস্থাও প্রায় এক। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের দিকে।

ওদের বিদায় জানাতে এসেছিলেন বৃদ্ধ, কিন্তু একটু আগে ঢাকা হয়ে যে খবর এসেছে, তাতে তিনিও বোকা হয়ে গেছেন। কাবুল থেকে বিসিআই এজেন্ট জলিল খবর পাঠিয়েছে ডন আর যূথীকে তাশকুরগান থেকে সরিয়ে বাঘলান শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেন, জানা যায়নি।

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল রানা। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে যাত্রাটা অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা পিছিয়ে দেয়া হোক, স্যার।'

চোখ কুঁচকে নিভে যাওয়া পাইপের দিকে তাকালেন তিনি, মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করে বললেন, 'তা ছাড়া আর উপায় কি? আমি ঢাকায় গিয়ে দেখি বাঘলানের কিছু ছবির ব্যবস্থা করি।'

মাথা দোলাল রানা। মাথার মধ্যে ঘুরছে রিভাইজড্ অপারেশনাল প্ল্যান তৈরির চিন্তা। পরের চারদিন খাগড়াছড়ির মানুষ আবার দেখল সেই কর্ডন, সেই মহড়া। তবে এবার ওরা যে ভবনকে কেন্দ্র করে দৌড়ঝাঁপ করল, সেটা আগেরটার মত নয়, অন্যরকম। অনেক ছোট।

চারদিন পর আবার সব হাওয়া। এই কদিন পতেঙ্গা বিমানবন্দরের এককোণে দাঁড়িয়ে থাকল হারকিউলিস সি-১৩০। এখানেও কাউকে ওটার ধারে ঘেঁষতে দেয়া হলো না। ফল যা হওয়ার তাই হলো, হাজারো গল্প জন্ম নিল এখানেও।

সেদিন অফিসে অনেক চেষ্টা করেও কাজে মন বসাতে পারল না হামিদা। জরুরী কিছু চিঠি টাইপ করা দরকার ছিল। কিন্তু ভুল হয়ে যাচ্ছে বারবার। একসময় বিরক্ত হয়ে কাজ বন্ধ করে বেয়ারাকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিল ও, অধৈর্য হয়ে রাষ্ট্রদূতের ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকল।

কি এক জরুরী কাজে বাইরে গেছেন তিনি, অফিসে এসে পায়নি সে। জালালও নেই, কেউ জানে না কোথায় গেছে সে। প্রায় দুপুর হয়ে এল, এখন পর্যন্ত অমন দামী খবরটা কাউকে দিতে পারল না বলে ভেতরের ছট্‌ফটানি ক্রমে বেড়েই চলেছে। অবশেষে দুটোর সময় ফিরল জালাল। ওর সাথে চোখাচোখি হতে এমন এক হাসি দিল, বুকটা ধড়ফড় করে উঠল হামিদার।

দুই গোলাপী গাল রাঙা হয়ে উঠল। সামলে নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'জরুরী কথা আছে আপনার সাথে।'

ওর ডেস্কের পাশে দাঁড়াল যুবক। এক কোণে রাখা সেদিনের চিঠিপত্র তুলে নিজের নামের কাল্পনিক চিঠি খুঁজতে খুঁজতে চাপা গলায় বলল, 'কি?'

মুখ খুলতে গিয়েও সামলে নিল মেয়েটি। রূমে আরও কিছু আফগান মেয়ে-পুরুষ কর্মচারী রয়েছে, ওদের অনেকেই তাকাচ্ছে থেকে থেকে। বিশেষ করে মেয়েরা। কাশির ছলে মুখ আড়াল করল হামিদা। 'অফিসের পরে, ছ'টায়। পার্কে।'

চিঠিগুলো সাজিয়ে রেখে চলে গেল যুবক। সময়মত পার্কের

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে বসল। আগে একদিন তাকে এখানেই নিয়ে এসেছে হামিদা। ব্যস্ত রাজপথের পাশে জায়গাটা। কিন্তু গাছপালা এত ঘন যে বিশ হাত দূরের রাস্তা থেকেও ভালমত দেখা যায় না। বেঞ্চে বসল জালাল, কয়েকদিনের বাসি ইয়া পুরু এক লন্ডন টাইমস্ মেলে ধরল চোখের সামনে।

দশ মিনিট দেরিতে পৌঁছল মেয়েটি। ওর বড় বড় চোখ সব সময় হাসে, কিন্তু এ মুহূর্তে হাসছে না। মনে হচ্ছে কোন কারণে ভয় পেয়েছে। একই বেঞ্চের আরেক মাথায় আড়ষ্ট হয়ে বসে পড়ল সে, ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে দু'হাতে শক্ত করে ধরল। বেশ নার্ভাস লাগছে ওকে।

'কি হয়েছে, হামিদা?' কাগজে মুখ আড়াল করে মৃদু গলায় বলল জালাল। 'ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে? এখানে কেন আসতে...'

'আপনার দেশী সাংবাদিক...ওদের সরিয়ে ফেলা হচ্ছে কাবুল থেকে,' হড়বড় করে বলল সে।

চমকে উঠল যুবক। 'কি বলছ?'

'হ্যাঁ। আজই খবর পেয়েছি আমি।'

'সে কি!' কয়েক মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করার ক্ষমতা তালগোল পাকিয়ে থাকল তার। 'কবে, কখন সরিয়ে নেয়া হবে?'

'সঠিক জানি না, তবে শুনেছি দুই-এক দিনের মধ্যে।'

'কোথায়...?'

'বাঘলানে।'

কিছু সময় ভাবল জালাল। শহরটা কাবুলের দেড়শো মাইল সোজা উত্তরে, কান্দুজ নদীর পুব তীরে। দুই শহরের মাঝ দিয়ে লম্বালম্বি পুবে চলে গেছে সাড়ে চব্বিশ হাজার ফুট উঁচু হিন্দুকুশ পর্বতমালার আফগান অংশ। ওখান থেকে উত্তরে রুশ বর্ডার, পুবে পাকিস্তান বর্ডার। দুটোই বেশ কাছাকাছি।

'বাঘলানে কোথায়?'

'একটা সুরক্ষিত বাড়িতে। তালেবান গার্ডরা পাহারা দেয় বাড়িটাকে।'

তাও ভাল, জালাল ভাবল। অন্তত তাশকুরগানের থেকে অনেক সহজে কাজ উদ্ধার করা যাবে ওখানে। যদিও তার জানা নেই ঢাকায় কি চলছে, কি পরিকল্পনা করছেন রাহাত খান। তবে ধারণা করছে, এখানে যখন কূটনীতিকের ছদ্মপরিচয়ে পাঠানো হয়েছে তাকে, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে এবং প্রতিটা খবর যথাসময়ে ঢাকায় রিলে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন কিছু না কিছু নিশ্চয়ই ঘটতে যাচ্ছে। হয়তো কমান্ডো হামলা চালিয়ে···

চিন্তার গাড়ি থামাল সে। 'বাড়িটা কোথায় জানো?'

মাথা দোলাল হামিদা। 'না। তবে জেনে নেব।'

'খুব সাবধান, কোন বিপদ বাধিয়ে বোসো না যেন।'

'জালাল?'

'বলো।'

'আমার খুব ভয় করছে।'

'কেন?'

'অফিসে আজ কোলিগরা ঘন ঘন তাকাচ্ছিল আমার দিকে। ওদের চাউনি সন্দেহজনক মনে হয়েছে।'

চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড বসে থাকল যুবক। এর অর্থ খুব সোজা। হামিদা সন্দেহের তালিকায় পড়ে গেছে। এখন ওর সাহায্য নিতে গেলে মেয়েটাকে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে ফেলা হবে। নিজেকেও। 'তাহলে এখন সতর্ক হতে হবে আমাদের। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, হামিদা। যথেষ্ট সাহায্য করেছ তুমি, আর দরকার নেই। আমার সাথে তোমার আর দেখা না হওয়াই ভাল।'

বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন যেন খালি খালি লেগে উঠল

হামিদার, মনে হলো বহু মূল্যবান কি যেন একটা হারিয়ে ফেলল এইমাত্র। সরাসরি জালালের মুখের দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

কপাল কুঁচকে উঠল যুবকের। 'কেন?'

'কারণ...কারণ আমি...আমি...' থেমে গেল হামিদা। উপযুক্ত ভাষা হয়তো খুঁজে পায়নি, অথবা হয়তো পেয়েও লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারেনি। কিন্তু তাতে জালালের ব্যাপারটা টের পেতে দেরি হলো না।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পত্রিকা গোটাতে শুরু করল সে। 'হামিদা, যদি কিছু সন্দেহ করে আমাদের অ্যারেস্ট করে বসে ওরা, তোমার সাহায্য কোন...' হঠাৎ গলা বুজে গেল ওর একদল তরুণের ওপর চোখ পড়তে। প্রায় আট-দশজন, চোদ্দ থেকে সতেরো-আঠারোর মধ্যে বয়স। দৈর্ঘ্য যাই হোক, দাড়ি আছে সবার গালে। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের চারপাশে ঘুরঘুর শুরু করেছে। ওদের চেহারায় ঝামেলা বাধানোর সুস্পষ্ট আভাস দেখতে পেল জালাল। 'উঠে পড়ো!' মুখের পাশ দিয়ে বলল, 'হামিদা, গেট আপ্! জলদি কেটে পড়ো এখান থেকে!' কথার ফাঁকে হাত চলছে, পত্রিকাটাকে টাইট করে পেঁচিয়ে ভারী, নিরেট এক ব্যাটন বানাচ্ছে।

মেয়েটি দেখল ওদের, বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'দাউদ!'

'কে?'

'আমার ভাই!'

হতভম্ব চেহারা হলো যুবকের। 'তোমার...কোনটা?' ওর নির্দেশ করা আঙুল অনুসরণ করে দাউদকে দেখল চোখ কুঁচকে। 'সঙ্গে ওরা কারা, বন্ধু?'

'জানি না। আগে কখনও দাউদের সঙ্গে দেখিনি ওদের।' গলা

কাঁপছে হামিদার, ভাইয়ের সীমাছাড়া অসভ্য আচরণ দেখে রেগে আগুন হয়ে গেছে। 'ওরা···ওরা মনে হয় তালেবান!'

'সব্বোনাশ, জলদি ভাগো! আমি পরে দেখা করব।'

'কিন্তু···'

'শাট আপ্!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল ও।

একই সঙ্গে তরুণদের একজন চেঁচিয়ে ডাকল জালালকে। 'অ্যাই, বাংলাদেশী হারামজাদা! এদিকে এসো, আলাপ করি।'

চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল জালাল। তরুণকে দেখে রিংলীডার মনে হলো। এক হাত কোমরে রেখে আরেক হাতে কাছে ডাকছে। ভাবখানা এমন, যেন তাতেই ও কৃতার্থ হয়ে এগিয়ে যাবে। ব্যাটার কোথায় প্রথম মারটা লাগাবে, কত ওজনের, মনে মনে হিসেব কষতে লেগে গেল জালাল। কাগজের ব্যাটনের এক প্রান্ত শক্ত মুঠোয় ধরে বসে আছে। অল্প অল্প দোলাচ্ছে দুই ফুটী ব্যাটন, ওজন বুঝে নিয়ে সন্তুষ্ট হলো। ওদিকে ডাকটা কানে আসামাত্র আর দেরি করেনি হামিদা, ঘুরে পার্কের গেটের দিকে এগোতে শুরু করেছে ব্যস্ত পায়ে। বারবার উদ্বিগ্ন চোখে ঘুরে তাকাচ্ছে।

'কি হলো?' রিংলীডার বলে উঠল। 'এসো না, কথা বলি!'

'কি কথা, আফগান পিগ?' বলে উঠে পড়ল ও, অনর্থক ঝামেলা এড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে, তাই হাঁটতে শুরু করল হামিদার পিছন পিছন।

'অ্যাই ব্যাটা, যাচ্ছিস কোথায়?' চেঁচিয়ে বলল তরুণ। 'এদিকে আসতে বলছি কানে যায়নি?'

না শোনার ভান করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল সে, কিন্তু হলো না। ও ভয় পেয়েছে ভেবে ছুটে এল কয়েকজন, দাউদও আছে তার মধ্যে। সবাই একযোগে চ্যাঁচাচ্ছে উত্তেজিত গলায়। সময়মত দাঁড়িয়ে পড়ল জালাল, ঘুরে দাঁড়াল। চেহারা স্বাভাবিক রেখে

বলল, 'কি হয়েছে?'

চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল তাকে ছেলেগুলো। লীডার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, এক হাত পিছনে। একটা দেড় ইঞ্চি ডায়ার দুই ফুট লম্বা জিআই পাইপ ধরা আছে সে হাতে। 'বলছিলাম, এসো, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে দুয়েকটা তালিম দিই তোমাকে,' বলল সে।

জালাল হাসল মিষ্টি করে। 'তাই? খুব ভাল কথা, পুণ্যের কথা। কিন্তু তুমি নিজে জানো "ইসলাম" শব্দের অর্থ কি?'

বোকাসোকা, মানসিক প্রতিবন্ধীর মত হে-হে করে হেসে উঠল সে দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে। সঙ্গীদের দিকে তাকাল 'ব্যাটা বলে কি!' ধরনের চেহারা করে। 'কেন জানব না? "ইসলাম" হচ্ছে গিয়ে···ইয়ে···মানে···'

'বুঝেছি,' হাত তুলে বাধা দিল জালাল। 'বিদ্যে পেটের বাইশ হাত নাড়িভুঁড়ির সাথে জড়িয়ে গেছে, বোমা মারলেও কোনদিন বের হবে না। সরো, যেতে দাও।'

'কি?'

'বোঝোনি?' পিছনে লঘু পায়ের শব্দ শুনে তৈরি হলো ও। 'গুড! তাহলে এবার অন্য ভাষায় বলছি, দেখো তো বোঝো কি না!' পরক্ষণে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'বলছি পথ ছাড়, শুয়োরের বাচ্চারা!'

একই সাথে লীডারের পাঁজর সই করে ব্যাটন চালাল গায়ের জোরে। ভারী, নিরীহদর্শন জিনিসটা দড়াম করে জায়গামতই পড়ল, মট্ মট্ করে দুটো রিব ভেঙে গেল তার। সময় নষ্ট করল না জালাল, পরক্ষণে চর্কির মত ঘুরেই আবার চালাল ওটা। পিছনে তিন হাতের মধ্যে এসে পড়েছিল একজন, পাইপ ছিল এর হাতেও। তুলতে যাচ্ছিল, এই সময় ওর রিফ্লেক্স দেখে জমে গেল

সে, অবিশ্বাসে ছানাবড়া হয়ে গেল চোখ। কিছু করার কথা ভাবার সময় পেল না ছেলেটা, আকাশ ভেঙে পড়ল বাঁ কানের ওপর। চাপা কট্ শব্দে জায়গা ছেড়ে সরে গেল চোয়ালের হাড়, চেহারা ত্যাড়া হয়ে গেল। পাইপ ছেড়ে মুখ চেপে ধরে দু'পা পিছিয়ে গেল সে।

জালাল চক্কর বন্ধ করল না, ওর ওপরই আরেকটু ঘুরে তৃতীয়জনের নাকে বসিয়ে দিল এক ঘুসি। পলকে পাকা টম্যাটোর মত থেঁত্‌লে গেল ওটা, দুই ফুটো দিয়ে সবেগে বেরিয়ে এল রক্তের দুটো ধারা। পরেরজন চোখের সামনে ওর অবিশ্বাস্য তাণ্ডব নৃত্য দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জমে গেছে জায়গায়।

হাতে ছুরি থাকতেও কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে ফেলল এক মুহূর্ত। সুযোগটা ষোলো আনাই নিল জালাল, ব্যাটনের মাথা দিয়ে ভয়ঙ্কর এক গুঁতো মেরে তার ডান চোখটা খুলির তিন ইঞ্চি ভেতরে সেঁধিয়ে দিল।

তারপর থামল যথেষ্ট হয়েছে ভেবে। হাঁপাতে হাঁপাতে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে থাকা দেহগুলো দেখে চুক্ চুক্ করে আফসোস প্রকাশ করল। বাকি ছয় তরুণ তখন পিছাচ্ছে, প্রত্যেকের নজর জালালের ওপর সেঁটে আছে বলে এ ওর পায়ে বাড়ি খেয়ে ঘন ঘন হোঁচট খাচ্ছে, আছাড় খাচ্ছে। পরক্ষণে উঠে পড়ছে তড়াক্ করে।

শ্রাগ করে হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল জালাল। 'কাউকে কিছু শেখাতে হলে আগে নিজেকে ভালমত শিখে নিতে হয়, বুঝলে? পরেরবার এই ভুল আর কোরো না। চলি, খোদা হাফেজ!'

ধীর পায়ে গেটের দিকে হাঁটতে লাগল সে।

রিসিভার রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল আফগান ইন্টারনাল সিকিউরিটি চীফ, কর্নেল নাজাফ মুরাদ। চেহারায় গভীর সন্তুষ্টি।

দুই বাংলাদেশী সাংবাদিকের ব্যাপারে ব্যবস্থা পাকা।

অবশেষে মোল্লা বরকতীর বিরুদ্ধে জয় হয়েছে তার। সেদিনের মক এগজিকিউশনের ফল শূন্য হওয়ায় ভীষণ খেপে গিয়েছিল ব্যাটা, সত্যি সত্যি মেরে ফেলতে চেয়েছিল ওদের, মুরাদ তা ঠেকিয়ে দিয়েছে। সরাসরি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করে তাকে বুঝিয়েছে, অপরাধ প্রমাণ না হতে মেরেই যদি ফেললাম, তাহলে ওদের পিছনে এতদিন সরকারের পয়সা আর খানা কেন অপচয় করলাম?

প্রেসিডেন্টও মোল্লা, তবে ঘটে বিচারবুদ্ধি কিছুটা হলেও রাখেন। তার কথায় ঝামেলার গন্ধ পেয়ে কি করে সমস্যার সমাধান করা যায়, ভাবতে বসে গেলেন। বরকতী তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী। পরীক্ষিত চামচা, তাকে অসন্তুষ্ট করতে চান না তিনি, মুরাদের মত এক যোগ্য অফিসারকেও অসন্তুষ্ট করতে চান না। জানতে চাইলেন, তার কি ইচ্ছে।

বলল মুরাদ। ডন এবং তার স্ত্রীর বিচার স্থগিত রেখে ওদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তার ওপর ছেড়ে দেয়া হোক, সাতদিনের জন্যে। এই ক'দিন কেউ তার সিদ্ধান্তে নাক গলাতে পারবে না। সাতদিন পর ওদের দু'জনের স্বীকারোক্তিসহ প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করবে মুরাদ।

রাজি হয়েছেন তিনি অবশেষে। বরকতীকে একটা কিছু বলে এই সময় পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখবেন কথা দিয়েছেন। সিদ্ধান্ত মনে মনে আগেই নিয়ে রেখেছিল মুরাদ, অনুমতি পাওয়ামাত্র তা কাজে পরিণত করতে উঠেপড়ে লাগল। তালেবান গার্ড হয়েও বরকতীর চেয়ে তারই প্রতি বেশি অনুগত আলি ও ইরাজকে জানিয়ে দিয়েছে পরিকল্পনা।

ড্রয়ার থেকে নতুন এক প্যাকেট আমেরিকান কেন্ট সিগারেট

বের করে একটা ধরাল কর্নেল। তালেবান শাসিত আফগানিস্তানে এ জিনিস নিষিদ্ধ হলেও তার পেতে কখনও অসুবিধে হয় না। নিয়মিত পায় সে–সিগারেট, দামী দামী আমেরিকান-ব্রিটিশ পানীয়, সব। পরপর কয়েক টান দিয়ে ডানদিকের IN ট্রের ফাইলের স্তূপের দিকে তাকাল। অনেক জমে গেছে।

অলস ভঙ্গিতে ওপরের ফাইলটা তুলে সামনে রাখল সে, ওপরের টাইপ করা লেবেল পড়ল। ওখানে লেখা আছে: হামিদা গুলিস্তানী, সেক্রেটারি, বাংলাদেশ দূতাবাস, কাবুল, বয়স ২০। কি ভেবে মুখ ভ্যাঙচাল কর্নেল, জায়গায় রেখে দিল ফাইল। পরে দেখা যাবে, ভাবল মনে মনে। এখন সময় নেই, এর চেয়ে জরুরী কাজ পড়ে আছে, আগে সেদিকে নজর দেয়া দরকার।

পতেঙ্গা বিমান বন্দর। তিনদিন পর।

স্কোয়াড্রন লীডার কাজী আনিসুজ্জামান ধ্যানমগ্নের মত বসে আছে দৈত্যাকার হারকিউলিস পরিবহন বিমানের ফ্লাইট ডেকে। শেষবারের মত পাওয়ার চেক সেরে নিচ্ছে। এয়ারফোর্সে সবচেয়ে অভিজ্ঞ পাইলট ছিল সে, বর্তমানে বিমানের পাইলট। দূরপাল্লার আন্তর্জাতিক রুটে চলাচল করে। কয়েকদিনের জন্যে তাকে ধার নিয়েছে বিসিআই।

রাত এগারোটা। চাঁদের আলো ছাড়া চারদিক অন্ধকার। সন্ধের পরপরই সমস্ত আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে বন্দরের। তার আগে, বিকেলে, সমস্ত সিভিল কর্মচারীকে বিশেষ ছুটির নামে ভাগিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। 'বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের' কথা বলে আর্মি টেক আপ করেছে বন্দরের দায়িত্ব।

দশ ফুট নিচে গাঢ় রঙের টিউনিক পরা চার-পাঁচটা দেহের কাঠামো দেখতে পেল কাজী আনিস। রানওয়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে

ককপিটের দিকে চেয়ে আছে। প্লেনের ল্যান্ডিং লাইটের আলোয় ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে লোকগুলোকে। চিন্তিত। কিছু নিয়ে আলোচনা করছে জরুরী ভঙ্গিতে।

এরমধ্যে 'অপারেশন থান্ডারবোল্টে' কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। ক্যাপ্টেন কামাল ও তার তিন সঙ্গীকে বাদ দেয়া হয়েছে রিভাইজড্ প্ল্যানে। মূল দলের সাথে ওরা নেই। অন্য পথে রওয়ানা হয়ে গেছে তিন দিন আগেই। নৌ-বাহিনীর এক গানবোট নিয়ে শ্রীলঙ্কা চলে গেছে তড়িঘড়ি আয়োজন করা 'শুভেচ্ছা সফরে'। আগের যে বিকল্প এস্কেপ প্ল্যান ছিল, ওটা একটু অন্যভাবে সাজানো হয়েছে বলে এই পরিবর্তন।

কো-পাইলটের দিকে তাকাল আনিস। হাসল চওড়া হাসি। চল্লিশের মত বয়স লোকটার, তার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। এক্স ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, সরোয়ার। যথেষ্ট অভিজ্ঞ পাইলট, কিন্তু এ ধরনের মিশনে এই প্রথম। সে-ও তাকাল, পাল্টা হাসি দিল, তবে নিষ্প্রাণ। এমন এক গুরুত্বপূর্ণ মিশনে একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে ফল কি হবে, সে কথা ভেবে উদ্বিগ্ন।

'র‍্যাম্প থ্রী এখনও একটু একটু সমস্যা সৃষ্টি করছে,' বলল সে বিড়বিড় করে। 'সময়মত খারাপ কিছু ঘটিয়ে না বসে।'

'গ্রাউন্ড ক্রুরা চেক্ করেছে ব্যাপারটা, তাই না?'

'তা করেছে, কিন্তু…' থেমে গেল সে রেডিওতে কল-সাইন শুনে।

'কন্ট্রোল টু আলফা পতেঙ্গা। ওয়ান ও সেভেন। কন্ট্রোল টু আলফা পতেঙ্গা…ওয়ান ও সেভেন। ইউ আর ক্লিয়ারড্ ফর টেক-অফ, ওভার।' থেমে গেল ক্যানকেনে ধাতব কণ্ঠস্বর।

শব্দ করে হেসে উঠল আনিস, ককপিটের গুমোট পরিবেশ কেটে গেল। 'গুড ইভনিং, কন্ট্রোল। দিস ইজ আলফা পতেঙ্গা।

থ্যাঙ্কস ফর ক্লীয়ারেন্স। নাউ, মে আই হ্যাভ সাম রানওয়ে লাইটস্, প্লীজ?'

হাসি শোনা গেল জবাবে। 'রজার, আলফা পতেঙ্গা।' পরমুহূর্তে হারকিউলিসের নাকের সামনে এক সঙ্গে জ্বলে উঠল তিন সারি দীর্ঘ, নীল ফায়ারফ্লাই। 'খোদা হাফেজ। ওভার।'

'কাল নাশতার টেবিলে দেখা হবে, কন্ট্রোল। ওভার।'

'ও হ্যাঁ, ডিম কি ভাবে খেতে পছন্দ, আলফা পতেঙ্গা?'

'মাঝারি পোচ, আস্ত কুসুম ওপরে,' জবাব দিল কাজী আনিস।

'কাট্ ইট!' অন্য একটা গম্ভীর গলা বলে উঠল মাঝখানে। 'কড়া রেডিও সাইলেন্স মেনে চলুন, প্লীজ!'

'সরি। আলফা পতেঙ্গা রোলিং। আউট।'

একসার পাওয়ার লিভার সামনে ঠেলে দিল সে। হুঙ্কার ছাড়ল বিশাল চার অ্যালিসন টার্বো প্রপ, অল্পসময়ের মধ্যে ওগুলোর সম্মিলিত শক্তি আঠারো হাজার হর্স পাওয়ারে উঠে এল। কানে তালা লাগানো এঞ্জিন পিচ প্রবল বেগে ঝাঁকাতে শুরু করেছে ককপিট ডেকিং। সরোয়ারের দিকে তাকাতে বুড়ো আঙুল তুলে সঙ্কেত দিল সে, সামনে ঝুঁকে ব্রেক রিলিজ করল কাজী আনিস। গড়াতে শুরু করল সীল-ছাপ্পরবিহীন হারকিউলিস। রানওয়ে সেন্টারলাইন অতিক্রম করার সময় একবার, দু'বার ঝাঁকি খেল নোজহুইল, দুলে উঠল পুরো ক্র্যাফট।

তারপর হু-হু করে বাড়তে থাকল দৌড়ের গতি, দোল কমে এল। বাতাসের বুক ছিন্নভিন্ন করে সাঁই-সাঁই ঘুরছে প্রপেলর ব্লেড। প্রথমে কয়েক মুহূর্ত আলাদা চেনা গেল প্রতিটা ফায়ারফ্লাইকে, তারপর আর সে উপায় রইল না, এক হয়ে তিনটে জ্বলজ্বলে মোটা দড়িতে পরিণত হলো ওগুলো।

'ভী ওয়ান,' রিপোর্ট করল সরোয়ার। দৌড়ের গতি নিরাপদ

ফ্লাইং স্পীড ১৩০ নটে উঠে পড়েছে। সময় হয়েছে। 'রোটেট।'

গতির তোড়ে নাক মনে হলো যেন উঁচু হতে শুরু করেছে হারকিউলিসের। কন্ট্রোল কলাম ধীরেসুস্থে পেটের দিকে টেনে আনল পাইলট, এইবার সত্যি সত্যি উঁচু হলো, এক সেকেন্ড পর হালকা এক ঝাঁকি প্রমাণ করল উঠে পড়েছে ওটা। তারপর আরেক ঝাঁকি–পিছনের লো স্লাং মেইন আন্ডার ক্যারিজও মাটির মায়া ছেড়েছে।

'গীয়ার আপ,' ভেরিফাই করল কো-পাইলট।

মাথা দুলিয়ে কন্ট্রোল কলাম পোর্টের দিকে খানিকটা ঘোরাল কাজী আনিস, দৈত্যাকার পাখা কাত হয়ে গেল, বাঁক নিতে শুরু করল হারকিউলিস। সোজা হতে অনেক নিচে ল্যান্ডিং লাইট দেখা গেল, এখন আবার আলাদা চেনা যাচ্ছে সবগুলোকে। ঢিলেঢালা মুঠোয় ধরা কন্ট্রোল চমৎকার কাজ করছে দেখে খুশি হলো সে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সাগরে পৌঁছবে ক্র্যাফট, চাঁদের আলোয় চকচকে সারফেসের অনেক কাছ দিয়ে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর হয়ে অনেক পথ ঘুরে আফগানিস্তান যাবে। উপায় নেই, লং রেঞ্জ মিলিটারি রাডারের চোখ এড়াতে হলে বেশি ওপরে ওঠা যাবে না।

সাগরের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কাজী আনিসুজ্জামান। শুরু হয়ে গেছে অনিশ্চিত 'অপারেশন থান্ডারবোল্টের' বিপজ্জনক যাত্রা।

চার

বাঘলান।

ঝিম্ মেরে বসে আছে ডন সিদ্দিক। চোখ বোজা।

বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। শক্ত কাঠের চেয়ারে বসিয়ে দু'হাত ব্যাক রেস্টের পিছনে এত মজবুত করে বেঁধে রাখা হয়েছে যে হাত কেটে বসে যাচ্ছে বাঁধন। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগে, চেষ্টা করেও আঙুল নাড়াতে পারছে না। কতক্ষণ পর মনে নেই, জোর করে চোখ মেলল সে, সঙ্গে সঙ্গে মুখের সামনে ঝুলন্ত জোরাল বালবের আলো যেন ঘুসি মেরে বসল দু'চোখে।

মাথা ঝাঁকাল ডন। রুমের চারদিকে তাকাল ঘোর লাগা চোখে। তারপর আলোর পিছনে চেনা মুখগুলো আছে কি না বোঝার চেষ্টা করল। আছে, আলি এবং রিয়াজ বসে আছে ধৈর্যের প্রতিমূর্তির মত। মুখে তালা।

'কেন এভাবে অনর্থক বসিয়ে রাখা হয়েছে আমাকে?' এক সময় না বলে পারল না ডন। 'কিছু বলছ না কেন তোমরা?'

'চুপ করে থাকো!' ওদের কেউ ধমকে উঠল। 'এখানে প্রশ্ন আমরা করব তুমি শুধু তার জবাব দেবে।'

'তাহলে বসে আছ কেন সঙের মত?' বিরক্ত হয়ে বলল ও। 'কোন্ ঘোড়ার ডিম প্রশ্ন করবে করছ না কেন?'

'অ্যাই ব্যাটা, চোপ্!' আলি বলল। 'কর্নেল সাহেব আসছেন। প্রশ্ন তিনি করবেন। উনি আমাদের বলেছেন তোমাকে বসিয়ে রাখতে, আমরা রেখেছি।'

হায় খোদা! ভাবল ডন, ওদের যখন গতকাল তাশকুরগান থেকে বের করে আনার আয়োজন চলছে, ও তখন ভেবেছে বুঝি মুক্তি দেয়া হচ্ছে। কী যে আনন্দ লেগেছিল! কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি লাগেনি। একটুপর যখন বদ্ধ প্রিজন ভ্যান ওদের নিয়ে রওয়ানা হয়, জেলগেটের গার্ডের সাথে কথা বলার সময় আলিকে কয়েকবার বাঘলান উচ্চারণ করতে শুনে যা বোঝার বুঝে ফেলেছে ডন। মুক্তি নয়, ওদের অন্য শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তবে ওর মধ্যেও কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে সে অন্তত বরকতীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে ভেবে। সেদিন রাতে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছিল হারামজাদা, তারপর থেকে ওর কথা ভাবলেও দেহে কাঁপুনি উঠে যেত। গলা-বুক শুকিয়ে উঠত।

এই শহরে আগে কয়েকবার এসেছে ডন পেশাগত কাজে। মোটামুটি চেনা। ছোট শহর। অধিবাসীদের শতকরা পঁচানব্বই জনই দারিদ্র্যসীমার নিচে। মূল শহরকেন্দ্রে কয়েক কিলোমিটার পাকা রাস্তা আছে, বাকি সব নুড়ির কার্পেটিং করা অথবা কাঁচা। শহরের পুবদিক দিয়ে বয়ে গেছে কান্দুজ নদী।

নদী! ভাবল ডন, দাঁড়াও, এক মিনিট! আজ খুব ভোরেই না পানির কুলকুল আওয়াজ শুনেছে সে? হ্যাঁ, তাই তো! আধো ঘুম আধো জাগরণে স্রোতের মৃদু আওয়াজ শুনেছে ডন পরিষ্কার। ভুলেই গিয়েছিল। আবার ডানে-বাঁয়ে তাকাল। তার মানে কি এই বাড়িটা নদীর তীরে? এত বড় বাড়ি···কোনটা হতে পারে?

চোখ বুজে স্মৃতির পাতা হাতড়াতে লাগল সে, শহরটার ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল। বেশি সময় লাগল না, বুঝে ফেলল সাংবাদিক। নদীর খুব কাছে কয়েকটা বাড়িই আছে. তার মধ্যে

বড় মাত্র দুটো। একটা মুজাহেদীন সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আহমেদ শাহ্ মাসুদের বড় বোনের স্বামীর, আরেকটা প্রধান মসজিদ। তার মানে এটা প্রথমটা! বুকের মধ্যে চাপা উল্লাস অনুভব করল সাংবাদিক।

প্রতিহিংসাপরায়ণ তালেবান সরকারের ভয়ে পালিয়ে পাকিস্তান চলে গেছে এ বাড়ির লোকজন, ডনের জানা আছে। তার মানে এটা···উচ্ছ্বাসের সল্‌তে নিভু নিভু হয়ে এল। না হয় নিশ্চিত হওয়া গেল বাড়ি সম্পর্কে, কিন্তু কি লাভ তাতে? সে খবর জেনে কি করবে সে? বন্দী অবস্থায় কি করার আছে?

আবার বোধহয় তন্দ্রার ঘোরে তলিয়ে গিয়েছিল, কানের কাছে কর্নেল মুরাদের, 'হ্যালো, ডন!' শুনে চমকে তাকাল। মুখের দেড় হাত সামনে তার হাসিমাখা চৌকো মুখটা দেখে ভেতরে কাঁপুনি উঠে গেল। 'কেমন আছেন?'

জবাব দিল না ও। কিছু সময় অপলক দেখল লোকটাকে, তারপর মুখ নামিয়ে চোখ বুজল।

'সে কি, ডন! পুরনো বন্ধুকে এভাবে স্বাগত জানানো···'

'বন্ধু!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল সে।

'অফ কোর্স, বন্ধুই তো!' হাসল মুরাদ। 'আপনি জানেন না, আর দু'দিন সময় পেলে বরকতী আপনাদের সত্যি সত্যি মেরে ফেলত। ব্যাপার টের পেয়েই না তাশকুরগান থেকে সরিয়ে আনলাম আপনাদের। আপনি যাই বলুন, ডন, এই দেশে যদি কোন বন্ধু আপনার থেকে থাকে, তো সে আমি। আমি চাই আপনারা নিরাপদে দেশে ফিরে যান। নতুন বিয়ে করেছেন, পরস্পরকে এখনও ঠিকমত জেনে-বুঝে উঠতে পারেননি। সে সুযোগ আমি করে দিতে পারি যদি আপনি মুখ খোলেন।'

'প্রথম থেকেই মুখ খোলা রেখেছি আমি···আমরা, কর্নেল।

কিছুই গোপন করিনি কারেমির। সে আমার হোটেলে গিয়েছিল, কিছু ডকুমেন্টস দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি নেইনি। ফিরিয়ে দিয়েছি।'

বাঁকা হাসি ফুটল কর্নেলের মুখে। 'কেচ্ছা শেষ?'

'হ্যাঁ।'

'অনেস্ট?'

'অনেস্ট।' কিন্তু মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্যে দু'চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করল তার সাথে, এবং ওইটুকুই চাইছিল কর্নেল। এই লাইনে বহুবছর কাটিয়েছে সে, মুখের সাথে চোখের ভাষার অমিল হলে কি বুঝে নিতে হয় জানে। ঝট্ করে সিধে হলো সে, আলি-ইরাজের উদ্দেশে চাপা হুঙ্কার ছাড়ল, 'ওর বউকে নিয়ে এসো!'

'কেন?' প্রতিবাদ করতে গেল ডন। 'ওকে কেন...'

'শাটাপ্! যা জানতে চাইছি বলো, নয়তো বন্ধ রাখো মুখ।'

দুই মিনিটের মধ্যে যূথীকে প্রায় ঝুলিয়ে এ ঘরে নিয়ে এল দুই গার্ড। নিজের পায়ে ঠিকমত দাঁড়াতে পারছে না ও, শক্তি পাচ্ছে না। ফোলা চোখের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া চাউনি দেখলে বোঝা যায় ঘুমিয়ে ছিল, ডাকাডাকির কষ্টে না গিয়ে স্রেফ তুলে এনেছে ব্যাটারা। মনে যাই থাকুক, কর্নেল মুরাদের নির্দেশ পালনে কোনরকম শৈথিল্য দেখাতে রাজি নয় আলি বা ইরাজ।

ডনের মুখোমুখি আরেক চেয়ারে বসিয়ে ওর হাত-পা বাঁধা হলো। একজন আলো ঘুরিয়ে সরাসরি ওর মুখের ওপর স্থির করল। কাটাছেঁড়া ড্রিল শার্টের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে যূথীর উদ্ধত, ভরাট বুক। গলা-বুক বেয়ে স্বেদবিন্দুর মত ফোঁটা ফোঁটা ঘাম গড়াচ্ছে, দুই স্তনের মাঝখানের গভীর উপত্যকায় হারিয়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকল মুরাদ। অন্যমনস্ক। আলি-

ইরাজের চোখে খাই খাই নজর। ওর ওই সম্পদ এত ভালভাবে দেখার সুযোগ এই প্রথম হয়েছে, চোখের মণি তাই নড়েই না।

কেন্টের একগাল ধোঁয়া সিলিঙের দিকে ছুঁড়ল কর্নেল। 'জিনিসটা নিয়ে এসো!'

তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল আলি, মিনিট পুরো হতে না হতে একই গতিতে ফিরেও এল লোহার তৈরি লাল বালতির মত কিছু একটা নিয়ে। গ্যালভানাইজড্ আয়রনের। 'এনেছি, কর্নেল।'

'ওদের সামনে ধরো। দেখতে দাও জিনিসটা কি।'

তাই করল সে। ভাল করে দেখল ডন, এবং ভুল ভাঙল। বালতি নয়, ওটা বিশেষ হেলমেট। চোখের জায়গায় দুটো কালো গর্ত। ওটার কি কাজ, বুঝতে পেরে গায়ের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠল, ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা।

সিগারেট মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল কর্নেল। 'চিনেছেন তাহলে? হ্যাঁ, আলেকজান্ডার দ্যুমার "দ্য ম্যান ইন দ্য আয়রন মাস্ক" উপন্যাসের সেই বিখ্যাত হেলমেটের আফগান সংস্করণ ওটা। খুব সাধারণ এক ডিভাইস, তবে ভারি কার্যকর। কল্পনা করুন ওটা এই খুবসুরাত মোহ্তারমার মাথায় বসিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পেটালে কি ঘটবে। ক্রমাগত ঘণ্টার মত আওয়াজ করবে ওটা। এত বিকট আওয়াজ, শুনতে শুনতে হয়তো শেষ পর্যন্ত চিরতরে বধির হয়ে যাবেন আপনার স্ত্রী।'

'হারামজাদা!' অসহায় রাগে অস্থির হয়ে উঠল ডন।

'কথা আদায়ের ইলেকট্রোড মেথডও কাজে লাগাই আমরা,' পাত্তা না দিয়ে বলে চলল মুরাদ। 'মেয়েদের বেলায় ওতে সুবিধে হয়। নিপ্‌লে অথবা ক্লাইটোরিসে··· বুঝলেন না?'

রাত সাড়ে এগারোটার দিকে রাজধানীতে ফিরে এল কর্নেল। বেশ সন্তুষ্ট। প্রথমদিনেই বেশ খানিকটা এগিয়েছে কাজ। ঘাবড়ে

গেছে সাংবাদিক। আরেকটু চাপ দিলে আজই হয়তো মুখ খোলানো যেত, কিন্তু মুরাদ তা করেনি। আরও পাঁচদিন সময় আছে হাতে, অনর্থক ব্যস্ত হওয়ার কি দরকার?

বাড়ির গেটে যখন জীপ থেকে নামল সে, ঠিক সেই সময় বিশাল এক কালো ছায়া শ্রীলঙ্কা উপকূল ছাড়িয়ে ভারত মহাসাগরে পড়ল, এক চক্কর দিয়ে উত্তরে চলল ওটা আরব সাগরের দিকে। পানির মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে আলফা পতেঙ্গা ফ্লাইট। থেকে থেকে এক আধটু ঝিলিক মারছে তারার আলোয়।

একসময় সহকারীর দিকে তাকালেন কাজী আনিস। 'অটোপাইলটের হাতে ব্যাটাকে সঁপে দেয়া গেলে ভাল হত, কি বলো? ক্লান্তি লাগছে।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসল কেবল সরোয়ার। জবাবে বলল না কিছু।

ওদিকে পিছনে, ককপিট ডেক থেকে সামান্য নিচে প্রকাণ্ড পেটের এক জায়গায় বসে আছে আট সদস্যের থান্ডারবোল্ট টীম। ক্যানভাস সীটে হাত-পা মেলে দিয়ে যে যার চিন্তায় মগ্ন। আসন্ন মিশনের ওপর সবাইকে কনসেন্ট্রেট করতে নির্দেশ দিয়েছে লীডার মেজর মাসুদ রানা, তাই করছে ওরা।

হারকিউলিসের বাঁক ঘোরা শেষ হতে সার্জেন্ট মোহাম্মদ শহীদ আপনমনে বলল, 'ভারত মহাসাগরে পড়েছি আমরা।'

'কি করে বুঝলে?' প্রশ্ন করল পাশে বসা দলের সবচেয়ে ছোটখাট সদস্য, ট্রুপার হেকমত আলি। 'অ্যানিমেল ইনস্টিংট্ না কি যেন বলে, তার সাহায্যে?'

চোখ কুঁচকে উঠল পাইলটের। 'এর মধ্যে অ্যানিমেল ইনস্টিংট্ আসে কি ভাবে? এতবড় জায়গা নিয়ে বাঁক ঘোরা টের পেয়েই...'

'সরি।' লাজুক হাসি হাসল হেকমত আলি। 'ভুলে গিয়েছিলাম

তুমিও পাইলট।' প্রিঅপ কনফাইনমেন্টের সময় রানার উৎসাহে সবার সাথে সবার সম্পর্ক তুমিতে নেমে এসেছে। এতে আন্তরিকতা বাড়ে। অবশ্য লীডারকে সবাই 'আপনি' বলে। সঙ্কোচের কারণে মুখ দিয়ে 'তুমি' বের হয় না।

'এখনও তাহলে সাগরের ওপর আছি?'

'হ্যাঁ। ঝাঁকি শুরু হলে বুঝবে মাটির ওপর দিয়ে চলছি।'

'ও।'

ঘুরে হেকমত আলিকে দেখল পাইলট। 'ব্যাপার কি, তোমাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে? প্লেনে চড়তে ভয় করে?'

'না। আমি ভাবছি আমার গিন্নির কথা।'

'কি হয়েছে তার?'

'হয়নি, হবে।'

'বাচ্চা?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল হেকতম আলি। 'হুঁম।'

চুপ করে গেল ওরা। ওদিকে, বাঁ সারির জানালার কাছে ক্যানভাস সীটে প্রায় শুয়ে আছে মাসুদ রানা। দু'হাত বুকে বাঁধা, পা মেলে দিয়েছে লম্বা করে। আফগান বিশেষ টুপিতে কপাল-চোখ ঢাকা। দেখে মনে হতে পারে ঘুমিয়ে আছে বুঝি, আসলে পুরো সজাগ।

অন্ধকারে হারকিউলিসের ভেতরের হালকা তেলতেলে গন্ধ আর প্রতিটা দোল অনুভব করার চেষ্টা করছে। সবকিছুর সাথে এক হয়ে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এতে লাভ হয়, যে কোন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়া সহজ হয়। এই অনিশ্চিত মিশনে ভাগ্যে কি আছে কে জানে! সাংবাদিক যুগলকে বাঘলানে কোথায় রাখা হয়েছে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও জানতে পারেনি ওরা। জালাল জানতে পারেনি। ওরা কাল্পনিক এক

রেপ্লিকা বানিয়ে নতুন করে মহড়া দিয়ে এসেছে, কিন্তু রানার মন তাতে ভরেনি। জালাল অবশ্য চেষ্টায় কোন ঢিলেমি করেনি। এখনও লেগে আছে। দেখা যাক, কি হয় শেষ পর্যন্ত।

আট মাইল ওপর থেকে স্যাটেলাইটের তোলা ছবি দেখে এ ধরনের রেইডের প্ল্যান করা, তারওপর ভিত্তি করে মহড়া দেয়া এবং সব কাজ ভালয় ভালয় শেষ করে ফিরে আসতে পারার চিন্তা অনেকটা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখার মত মনে হয় ওর। অবশ্য ছবিগুলো যে খুবই স্পষ্ট ছিল, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এতই পরিষ্কার যে কাবুল বা বাঘলানের রাস্তায় চলমান গাড়ির নাম্বার প্লেট পড়তেও একটু সমস্যা হয়নি। তবু অস্বস্তি খানিকটা রয়েই গেছে।

ক্যাপ সরাল ও, পিছনে তাকাল। মৃদু, লালচে ইন্টেরিয়র আলোয় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুই লং হুইল বেজড্ ল্যান্ড রোভারকে ভীষণরকম জান্তব মনে হচ্ছে। ধূসরের ওপর হালকা কালচে ডোরাকাটা রঙ ওগুলোর–ডেজার্ট ক্যামোফ্লেজ। জায়গায় ধরে রাখার জন্যে প্যারাস্যুট প্যালেটের সাথে বাঁধা আছে ওগুলো।

বিসিআইয়ের সংরক্ষিত বিশেষ অ্যাপারেটাসের অংশ ও দুটো–পিঙ্ক প্যান্থার। স্পেশাল ফাইটিং মেশিন, ভারি বিশ্বস্ত। রিইনফোর্সড চেসিস, ষোলো ইঞ্চি চওড়া গভীর থ্রেডের স্যান্ড টায়ার আর দানবীয় শক্তির সুপারচার্জড ভি-৮ এঞ্জিন চালিত গাড়ি দুটো মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের হোম বেজ হিসেবে ব্যবহার হবে।

কাজের সময় যা যা দরকার, সবই আছে ওতে। সাইড বিনের ডস-ব্যাগে আছে সেসব। যন্ত্রপাতি, গোলাগুলি, অস্ত্র ও গাড়ির পার্টস, পানি ও ফুয়েলের জেরিক্যান, পার্সোন্যাল কিট্, কমিউনিকেশনস্ ইকুইপমেন্ট এবং অস্ত্রের বড়সড় এক ভাণ্ডার।

এছাড়া বনেটে বিশেষ কায়দায় সেট করা আছে এল-৩৭ জিপিএমজি, বোতাম টিপলেই মাথা তোলে। লো-ফ্লাইং ক্র্যাফট বা লাইট আর্মার্ড ট্রাকের মোকাবিলায় যথেষ্ট। সব মিলিয়ে দারুণ এক গাড়ি।

তেমনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মিশনের অন্য সদস্যরা। যে যার ক্ষেত্রে মহাওস্তাদ ফরোয়ার্ড খেলোয়াড় একেকজন। এগিয়ে যেতে জানে, পিছাতে নয়। মারতে জানে, মরতে নয়। পাইলট শহীদকে দেখল রানা। সমীহের দৃষ্টি ফুটল চোখে। এতজন স্পেশালের মধ্যে সেরা স্পেশাল সে। টীম লীডারের সাথেও যে কোন দিক থেকে টেক্কা দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

বুদ্ধি, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা, কয়েক ভাষায় কথা বলার যোগ্যতা, এক্সপ্লোসিভ ও ডেমোলিশন, কমিউনিকেশনস্ এবং কম্পটার চালনা, সবকিছুতে বিশেষজ্ঞ। এসবের বেশিরভাগ অর্জন করেছে সে সার্ভিসে, বাকিটা বিসিআইয়ে যোগ দেয়ার পর। ওকে সংস্থার গৌরব আখ্যা দেয়া যায় নির্দ্বিধায়। 'রিজার্ভ' তিনজনের একজন ও।

সিগারেট ধরাল রানা। শুয়ে সিলিং দেখতে লাগল। টানা গোঁ-গোঁ শব্দে উড়ে চলেছে হারকিউলিস, বিরক্তিকর একঘেয়ে ফ্লাইট। এক সময় ইরানের আকাশে ঢুকল, বর্ডার অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকা স্টারসাইডে রেখে হাঁ-হাঁ করে ছুটল সামনে। খানিকটা যেতে প্লেনের বিশেষ রাডারে এক এয়ারবোর্ন ইরানী রাডারের সাড়া পেয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আতঙ্কিত হয়ে উঠল আনিস। 'ইন্টারসেপ্ট' করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা।

কিন্তু হাইট আরও লূজ করে ফাঁড়া কাটাল সে, ওদের রাডার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সি-১৩০। পাহাড়ী অঞ্চলের বিভ্রান্তিকর সমস্ত ছবির মধ্যে ইরানীরা হারিয়ে ফেলল ওদের। তারপর আবার

একঘেয়ে চলা। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলছে আলফা পতেঙ্গা। একটুপর ঢুকে পড়ল আফগান আকাশসীমায়, ক্রমে কাছিয়ে আসতে থাকল ড্রপ-জোন।

জায়গাটা কাবুল ও হিন্দুকুশের মাঝখানের খুদে শহর চারিকার সামান্য উত্তরে। হিন্দুকুশের পেটের মধ্যে তিন মাইল লম্বা তেকোনা এক সমতল খোলা ব্রেক ওটা। চারদিকে উঁচু পাহাড়ের চূড়া, মাঝখানে ফাঁকা। ভেতরে নামা এবং ওঠার জন্যে দু'মাইল জায়গা পাবে পাইলট। যথেষ্ট। তবে সময়ের হিসেবে এক সেকেন্ড এদিক-ওদিক হয়ে গেলে সর্বনাশ, ওঠার সময় সোজা দশ হাজার ফুট উঁচু চূড়ায় আছড়ে পড়বে আলফা পতেঙ্গা।

সেই আশঙ্কার কথা ভাবতে গিয়ে ঘাম ছুটে গেল কাজী আনিসের। 'ওকে, সরোয়ার,' সময় হয়ে এসেছে বুঝে বলল। 'ডিজেড এসে পড়েছে। ডিসপ্যাচারদের বলো সবাইকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিতে। দশ মিনিট পর জাম্প করতে হবে।'

ইন্টারকমে কো-পাইলটের ঘোষণা শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকগুলো। ঝটপট খুলে ফেলা হলো পিঙ্ক প্যান্থারের বাঁধন, থান্ডারবোল্টের সদস্যরা যে যার জাম্প হেলমেট পরে ফ্লাইট ডেকের নিচের বে-র সামনে জড়ো হলো, একজন অন্যজনের প্যারাস্যুটসহ যাবতীয় পার্সোন্যাল কিট নেয়া হয়েছে কি না, ঠিকমত বাঁধা হয়েছে কি না, চেক্ করতে লাগল নীরবে। কাজ শেষ হতে পরস্পরের উদ্দেশে বুড়ো আঙুলে 'ওকে' সঙ্কেত দিল তারা।

প্রত্যেকে টের পেল প্লেনের নাক ওপরমুখো হতে শুরু করেছে হিন্দুকুশের বেড়া ডিঙানোর জন্যে। এসে পড়েছে ডিজেড। পাকস্থলীতে অদ্ভুত এক অনুভূতি জাগল রানার, মনে হলো সব খালি হয়ে গেছে ভেতরে। পোর্ট উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল ও,

বিশাল সব বোল্ডার বিছানো আবছা একেকটা চূড়া সাঁ সাঁ করে উল্টোদিকে ছুটে যাচ্ছে।

পাইলট লোকটা যেন ঠিক জায়গায় নিয়ে এসে থাকে ওদের, মনে মনে বলল রানা। কোন ভুল যেন না হয়ে থাকে তার। প্লেনের নাক আরও উঠল, তারপরই আবার নিচু হতে শুরু করল। এসে গেছে!

ক্রসউইন্ড কয়েক মুহূর্তের জন্যে দুলিয়ে দিল প্রকাণ্ড উড়ন্ত দানবটাকে, অনেক কষ্টে পরিস্থিতি সামাল দিল পাইলট। কো-পাইলট সইচ টিপে টেইলর‍্যাম্প খুলে দিল। ধীরে ধীরে হাঁ হয়ে গেল পিছনটা। আচমকা বাতাসের চাপে বাইরের ধুলোবালি ভেতরে ঢুকে উন্মত্তের মত ছোটাছুটি শুরু করল। একটুপর থেমে গেল তা, বিশুদ্ধ পাহাড়ী, ঠাণ্ডা বাতাসে শীত লেগে উঠল সবার।

ভেতরে একটা লাল লাইট টিপ টিপ করে জ্বলেছে। রেডিও অল্টিমিটার আটশো ফুট শো করতে নিভে গেল ওটা, পাশে আরেকটা সবুজ জ্বলে উঠল। সাথে সাথে এক্সট্র্যাকশন শ্যুট রিলিজ করল পাইলট, প্যান্ট্রারের প্যালেটে বাঁধা একশো ফুট লাইনের কয়েলে ঢিল পড়ল, অমনি পিছনের গ্যাপের দিকে গড়াতে শুরু করল ও দুটো।

'লোড মুভিং,' ইন্টারকমে তাকে রিপোর্ট করল ডিসপ্যাচার।

গতি বেড়ে গেল প্যান্ট্রারের, একটা সাঁ করে গায়েব হয়ে গেল। তারপর অন্যটাও। ফড়াৎ ফড়াৎ শব্দে খুলে গেল ওদের প্যারাস্যুট। ওদিকে প্লেনের গতি ১১৫ নটে ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কাজী আনিস, অসম্ভব কঠিন কাজ। সতেরোশো মিটারের সাতশো ততক্ষণে খেয়ে ফেলেছে হারকিউলিস।

'লোড গন,' বলল ডিসপ্যাচার। উদ্বিগ্ন চোখে রানাকে দেখল। 'এরিয়া ফুরিয়ে আসছে, মেজর। গো!'

'ওকে, লেট'স গো!' সঙ্কেত দিল রানা সবাইকে।

পিছনের ক্রীম মাখা কালো মুখগুলোয় হাসি ফুটল। লীডারের পিছন পিছন দৌড়ে র‍্যাম্পের দিকে চলল সবাই, দেখতে দেখতে হাওয়া হয়ে গেল অন্ধকার রাতের আকাশে। কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল, 'খারা, আইতাছি!' শেষের শব্দটা শোনা গেল না অবশ্য, টান মেরে ছিনিয়ে নিয়ে গেল দুরন্ত বাতাস।

ওদিকে ককপিটে মনে মনে মরে গেছে কাজী আনিসুজ্জামান। পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, সময় শেষ। সরোয়ার উইন্ডশীল্ডে নাক প্রায় ঠেকিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ভয়ে, উত্তেজনায় চেহারা ফ্যাকাসে। 'সম্ভব না,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল সে। 'শেষ...!'

কাজী আনিসের চেহারা সাদা হয়ে গেছে, বিস্ফারিত চোখে সামনে থেকে দ্রুত ধেয়ে আসা হিন্দুকুশের নিরেট দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। আর কত দেরি ওদের? ভাবছে সে। আর কত...'

'স্টিক গন!' অবশেষে ঘোষণা করল ডিসপ্যাচার।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যান্ত হয়ে উঠল পাইলট, এক ঝট্‌কায় কন্ট্রোল কলাম নিজের দিকে টেনে আনল, একই মুহূর্তে অন্য হাতের তালুর গোড়ার এক ধাক্কায় সামনে ঠেলে দিল পাওয়ার লিভার। রেডিও অল্টিমিটারের কাঁটা র‍্যাপিড রাইডিং শো করতে আরম্ভ করল তক্ষুণি। চারটে প্রচণ্ড শক্তিশালী অ্যালিসন ঠেলে ওপরে তুলে দিতে লাগল হারকিউলিসকে। ওগুলোর সম্মিলিত চিৎকার চারদিকের পাথরের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ভয়াবহ প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। মনে হলো নরকের সমস্ত শয়তান বুঝি নেমে এসে ধ্বংসের সুর তুলেছে বাঁশিতে।

উঠছে হারকিউলিস...উঠছে। নাক একদম খাড়া, যেন আকাশ ছুঁতে চায়। হ্যান্ডহোল্ড ধরে অসহায়ের মত ঝুলছে ডিসপ্যাচাররা।

হাত ছুটলেই শেষ। র‍্যাম্প লক্ হওয়ার মুহূর্তখানেক আগে পিছনের তেকোনা ডিজেড চোখে পড়ল তাদের, একইসঙ্গে বেলুনের মত গাঢ় রঙের কয়েকটা অ্যারোফয়েল প্যারাস্যুটও।

পরক্ষণে পেটের তলা দিয়ে সাঁ করে পিছিয়ে গেল কালচে হিন্দুকুশ, খুব বেশি হলে পঁচিশ ফুট নিচে দিয়ে। ভয় কেটে যেতে গর্বে বুক ভরে উঠল কো-পাইলটের। পাশে স্কোয়াড্রন লীডার কাজী আনিস হাসছে, দাঁত দেখা যাচ্ছে তার।

একটুপর ঘুরে দক্ষিণমুখো হলো আলফা পতেঙ্গা, একশো ফুট উচ্চতায় নেমে এসে ছুটে চলল সুদীর্ঘ ফিরতি পথ ধরে।

মুখ তুলে ওটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল মাসুদ রানা, আওয়াজও মিলিয়ে গেল একটু পর। এবার দোল খেয়ে নামতে থাকা সঙ্গীদের দিকে নজর দিল ও। ক্যানোপি ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়া বাতাসের মৃদু শিস ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। আল্ট্রামেরিন আকাশের পটভূমিতে অদ্ভুতুড়ে লাগছে হিন্দুকুশের চূড়াগুলোকে।

নিচে তাকাল রানা, গাছ, মাটি বা পাথর, কিছুরই দেখা নেই। তবু সতর্ক থাকল। যে কোন মুহূর্তে সাঁ করে উঁঠে আসতে পারে ওর যে কোন একটা, অসতর্ক থাকলে হাত-পা ভাঙা, কি খুলি গুঁড়ো হয়ে যাওয়া, কোনটাই অসম্ভব নয়। ভাবতে ভাবতেই আচমকা দেখা দিল ঊষর পাথুরে মাটি। স্ট্র্যাপ শক্ত করে ধরে হাঁটু ভাঁজ করল ও। ল্যান্ডিং এত চমৎকার হলো যে বিশ্বাসই হতে চাইল না। পা মাটি ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি, পেটের কাছের রিলিজ রিং মুচড়ে খুলে দিল রানা, বেরিয়ে এল হার্নেসের বাঁধন থেকে। পরক্ষণে ব্যস্ত হাতের কয়েক টান ও চাপড়ে স্যুটের বাতাস বের করে দিল।

সাব-মেশিনগান নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এক মুহূর্ত পর।

সম্পূর্ণ তৈরি। নার্স খন্দকার জাহাঙ্গীর নামল পঞ্চাশ ফুট দূরে। ওর ল্যান্ডিং সুবিধের হয়নি, পাথুরের বুকে তার বুট ঘষটানোর শব্দে বুঝল রানা। বেশ কয়েক ফুট টেনে নিয়ে গেছে তাকে স্যুট। অবশ্য দুই মিনিটের মধ্যে নিজেকে মুক্ত করে রানার সাথে এসে যোগ দিল সে।

দু'মিনিট পর খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল মোহাম্মদ শহীদ। 'কি হয়েছে?' উদ্বেগ ফুটল রানার কণ্ঠে।

'তেমন কিছু না। গোড়ালিতে লেগেছে একটু।'

'কোন চিন্তা কোরো না,' অভয় দিল ডাক্তার। 'আমার কাছে ব্যবস্থা আছে, ঠিক হয়ে যাবে।'

খুঁজতে খুঁজতে দুই পিঙ্ক প্যান্থারের কাছে পৌঁছল ওরা। দ্বিতীয় ড্রাইভার ফয়েজ মোহাম্মদ আগেই পৌঁছে গেছে ওখানে। ঝাঁকি নিরোধক হানিকুম প্লাটফর্মের ওপর বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে থাকা একটাকে প্যালেটের বাঁধনমুক্ত করে চালিয়ে এনে মাটিতে দাঁড় করিয়েছে সে। দশ মিনিটের মধ্যে অন্যরাও একে একে এসে হাজির হলো।

'স্যুট আর প্যালেটগুলো এক জায়গায় করো,' নির্দেশ দিল রানা। 'ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ফেলতে হবে।'

'চুপ্, চুপ্!' হঠাৎ ফিসফিস করে বলে উঠল হেকমত আলি। ঝপ্ করে এক হাঁটুতে গেড়ে বসে সাব-মেশিনগান তুলল। অন্য সবাই ঘুরে তাকাল ওটার নলের নিশানা অনুসরণ করে।

'কি হয়েছে?' বলল আলালউদ্দিন খান পাঠান।

'একটা শব্দ শুনলাম,' জবাব দিল সে। 'ধাতব শব্দ, ঘণ্টার মত। ওই যে···শুনতে পাচ্ছ?'

'কই···কোথায়?'

'চুপ্ করো!' রানা চাপা ধমক লাগাল। খুব আবছা হলেও

আওয়াজটা শুনেছে ও। নীরব হয়ে গেল সবাই, কান খাড়া করে অপেক্ষায় থাকল। মিনিট তিনেক পর হঠাৎ একটা নড়াচড়া দেখা গেল অন্ধকারে। আটটা সাব-মেশিনগান স্থির হয়ে থাকল সেদিকে। আরও একটু পর পরিষ্কার দেখা গেল জিনিসটাকে। একটা ভেড়া! গলায় বাঁধা ঘণ্টা ঠুন-ঠুন আওয়াজ তুলছে।

'ধুর!' তীব্র হতাশা ফুটল হেকমত আলির কণ্ঠে।

'কথা বোলো না!' ফের চাপা গলায় সতর্ক করল রানা। 'গলায় ঘণ্টা বাঁধা ভেড়ার সঙ্গে রাখালও থাকে। চলো কেটে পড়ি।'

প্রায় নিঃশব্দে স্টার্ট নিল প্যান্থার ওয়ান। গিয়ার দিল হেকমত আলি, ক্লাচ ছেড়ে এক্সিলারেটরে চাপ দিল। হেভি ডিউটি টায়ার প্রথমে খানিক ধুলো আর নুড়ির মেঘ তৈরি করল জায়গায় চক্কর কেটে, তারপর দাঁত দিয়ে মাটি কামড়ে ঠেলে নিয়ে চলল চারজনের ব্যাক-আপ টীমটাকে।

চালকের পাশে বসা মোহাম্মদ শহীদ ভীষণ অস্বস্তি বোধ করল অন্ধকারে ছুটতে হচ্ছে বলে। মরুভূমিতে ইনফ্রা-রেড হেডলাইটের সাহায্যে ড্রাইভ করা মোটেই যা-তা ব্যাপার নয়। যে কোন মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

'সাবধান, হেকমত আলি,' বলল সে। 'আস্তে চালাও, বেশি হেকমতি দেখাতে যেয়ো না।'

খাকি রঙের ধাতব কমন ইউজার বিনকিউলারের ফ্রেমের নিচে লোকটার চওড়া হাসি দেখা গেল। 'হেকমতির দেখেছ কি? সবে তো শুরু হলো!'

সঙ্গীর চেয়ে অনেক সুবিধেজনক পর্যায়ে আছে সে বিদঘুটে গগলসের মত জিনিসটা পরে। ওটার নিজস্ব পাওয়ার প্যাকের

উৎপন্ন আই আর হেডল্যাম্প বীমের সাহায্যে প্রতিটা চূড়া জ্বলজ্বলে ব্যাটনের মত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। দারুণ সিস্টেম, তবে বর্তমানে ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে অন্য সমস্ত অত্যাধুনিক আবিষ্কারের কাছে।

'সে তো বুঝলাম, কিন্তু...'

'কিচ্ছু চিন্তা কোরো না, আমি জানি কোথায় যাচ্ছি আমি।'

'দেখো। পাহাড়ে চড়ে বসার আগে জানাতে ভুলো না।'

হাতের পার্সপেক্স ফেসড্ ক্যানভাস কেসের ভেতরে সেট করা এই অঞ্চলের ডিটেইলড্ ম্যাপের দিকে নজর দিল সে। নিচের ম্যাপ লাইটের আভায় ম্যাপের প্রতিটা সূক্ষ্ম রেখাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'কিছুটা সামনে ল্যান্ড স্লিপের স্তূপ আছে। ডানদিকে। সাবধান!'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল হেকমত।

টানা দশ মিনিট ঝড়ের বেগে ছুটল দুই প্যান্থার। আলো ফোটার আগে বাঘলানের যত কাছে পৌঁছানো যায়, ততই লাভ। সাড়ে তিনটের দিকে একটা রাস্তা পার হয়ে ফের উঁচুনিচু মরুভূমিতে পড়ল। নিজের ম্যাপের সাথে রাস্তাটা মিলিয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। প্যান্থার টুতে আছে ও। যে রাস্তাটা ফেলে এল, ওটার দক্ষিণ মাথায়, মরুভূমির মধ্যে পরিত্যক্ত এক এয়ারস্ট্রিপ আছে। সব যদি ঠিক থাকে, পাঁচদিন পর ওদের তুলে নিতে ওখানে ল্যান্ড করবে আলফা পতেঙ্গা।

ভোরের আলো ফোটার আগে কান্দুজ নদীর তীরের ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ওরা। অনেক গভীরে এসে থামল, স্টার্ট বন্ধ করে হ্যান্ডব্রেক টেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল দুই ড্রাইভার।

গাড়ি থেকে নামল সবাই। চারদিকে নজর বুলিয়ে পরিবেশ দেখে সন্তুষ্ট হলো রানা। চমৎকার জায়গা। দিনের পর দিন লুকিয়ে

থাকলেও কেউ টের পাবে না। গতকাল চট্টগ্রামে ডুবতে দেখা সূর্য আজ আফগানিস্তানে উদয় হতে যাচ্ছে ভেবে আজব এক অনুভূতি জাগল ওর। একটাই সূর্য, অথচ এই আলোয় বাইরে মুখ দেখাবার স্বাধীনতা কতই না সীমিত ওদের। কী অদ্ভুত!

ফ্যাকাসে সোনালী আভা ফুটল পুব আকাশে। পাখিরা বাসা ছাড়ল। অপ্রত্যাশিত অতিথিদের দেখে নিজেদের ভাষায় কিছুক্ষণ আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাল, তারপর ফল হবে না বুঝতে পেরে উড়ে চলে গেল।

ওদের মাথার অনেক ওপরে, হিন্দুকুশের এবড়োখেবড়ো গা সূর্যের আলোয় হেসে উঠল।

'পাঠান মুলুকে সবাইকে স্বাগতম,' হাসিমুখে বলল জাফর আহমদ। 'তবে দেখেশুনে চলতে হবে, কারণ এদেশের আবদুর রহমানরা মরে গেছে অনেক আগে। রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালারাও নেই। আছে...'

আসন্ন মিশনের চিন্তা হঠাৎ পেয়ে বসায় শেষটুকু শোনা হলো না রানার। ও ভাবছে বাকি পথের কথা। বাঘলান পৌঁছতে একটা মাউন্টেন রেঞ্জ আর পঁয়ষট্টি মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে ওদের। তারপর...

কি তারপর?

পাঁচ

দীর্ঘদেহী দুই আফগান ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে বাঘলানের পথ

দিয়ে। তাদের মলিন সালোয়ার-কুর্তা, উলের টুপি, দাড়ি, সব ধুলোবালিতে একাকার। একজনের হাতে একটা হোল্ড অল। ঘুমের অভাবে চোখ লাল। লম্বায়-পাশে প্রায় একইরকম দু'জনে। কোনদিকে নজর নেই তেমন, এদিক-ওদিক, কোনদিকেই তাকাচ্ছে না। মনে হয় নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য আছে।

নদীতে একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ের লাফঝাঁপ দেখে মৃদু হাসি ফুটল একজনের মুখে। 'কী সুন্দর!' খাস বাংলায় বলে উঠল সে। 'আমাদের শিশুরাও গরমের সময় এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোসল করে।'

মাথা ঝাঁকাল দ্বিতীয়জন। 'জ্বি।' একটু চুপ থেকে আবার বলল, 'আমরা ঠিক পথেই যাচ্ছি তো, রানা ভাই?'

'আমাদের ইনফর্মার যদি কোন ভুল না করে থাকে, তাহলে ঠিক পথেই যাচ্ছি।'

আর কথা বলল না শহীদ। ক্লান্ত, আড়ষ্ট পা টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে চলল নিজেকে। আর চলে না, ইচ্ছে করছে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ে।

'প্রায় এসে পড়েছি,' রানা বলল। 'বাঁচলাম! পা আর চলছে না।'

ওকে অকপটে মনের কথা প্রকাশ করতে শুনে ঘুরে তাকাল শহীদ। ওর হতচ্ছাড়া চেহারার সাথে নিজেরটা মিলিয়ে নিল মনে মনে। সত্যিই ভীষণ ক্লান্ত ওরা, অসম্ভব পরিশ্রান্ত। পরশু সন্ধের পর মূল দল ছেড়ে এসেছে ওরা চারজন—মাসুদ রানা, শহীদ, আলালউদ্দিন ও জাফর। পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে একনাগাড়ে হেঁটেছে দু'রাত। গতরাতে, শহরের বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের এক গোপন হাইড আউটে পরের দু'জনকে রেখে এসেছে রানা বিশেষ উদ্দেশে।

মূল শহর ছাড়িয়ে এল ওরা। পথের পাশের উঁচু দেয়ালের এক বাউন্ডারি ওয়ালের সামনে থেমে সিগারেট ধরাল রানা, এই ফাঁকে নজর বুলিয়ে নিল চারদিকে। তেমন কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে দেয়ালে ফিট্ করা বন্ধ কাঠের দরজায় নক্ করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে বোল্ট খোলার আওয়াজ শোনা গেল। দরজা খুলে চাদর মুড়ি দেয়া পটলচেরা চোখের এক যুবতী উঁকি দিল। 'আসসালামু আলাইকুম! কি করতে পারি আপনাদের জন্যে?'

'ওয়াআলাইকুম আসসালাম,' মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর বিশুদ্ধ পশতুতে বলল, 'আমরা দুই বন্ধু অনেক দূর থেকে আসছি। খুব ক্লান্ত। এখানে একটু বিশ্রাম নিতে চাই সুযোগ থাকলে। আর, একজন ভাল সিলভারস্মিথের খোঁজ চাই, জরুরী কিছু কাজ করাতে হবে।'

নির্ধারিত আইডেন্টিফিকেশন কোড শুনে চোখ হেসে উঠল যুবতীর। বিস্ময় ফুটল এক বিদেশীর মুখে চোস্ত দেশী ভাষা শুনে। 'তাহলে ঠিক জায়গাতেই এসেছেন আপনারা, মুসাফির। আসুন।'

'আল্লাহ্ আপনার মনের বাসনা পূরণ করুন।'

ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। বেশ পুরানো বাড়ি, সামনে বড় আঙিনা। তার মাঝখানে একটা ফোয়ারা। বন্ধ অবশ্য, নষ্ট। দরজা বন্ধ করে ঘুরল যুবতী, পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে চলল ওদের। উঁচু খিলানের মত মূল দরজা দিয়ে ভেতরের হোয়াইটওয়াশ করা এক রূমে এনে বসতে অনুরোধ করল। ফ্লোরে বিছানো কার্পেটে বসার ব্যবস্থা দেখে খুশি হয়ে উঠল ওরা। শোয়া-বসা, দুটোই চলবে।

ওদের সাড়া পেয়ে আরেক দরজা দিয়ে রূমে ঢুকল জালাল। সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময় সেরে মেয়েটিকে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সে। 'এ আমার গাইড, হামিদা গুলিস্তানী। এর

সাহায্য ছাড়া জিম্মিদের ট্রান্সফারের খবর জানা হয়তো সম্ভব হত না আমার পক্ষে। আমাদের জন্যে অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছে হামিদা।'

'আমরা সে জন্যে কৃতজ্ঞ, হামিদা,' রানা বলল। 'অনেক ধন্যবাদ।'

লজ্জা পেল মেয়েটি। 'আপনাদের খানার ব্যবস্থা করে আসছি,' বলতে বলতে দ্রুত বেরিয়ে গেল। রানাকে মিটিমিটি হাসতে দেখে এবার জালালও লজ্জা পেল। 'আর বলবেন না, কি করে যে ওর মনে ধরে গেল আমাকে,' শ্রাগ করল।

'এতে লজ্জার কি আছে?' তার পিঠ চাপড়ে দিল ও। 'ভাগ্যবানদের ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে।' একটু পর কাজের কথা পাড়ল, 'খোঁজ পাওয়া গেছে ওদের?'

'হ্যাঁ। হামিদা খুঁজে বের করেছে।'

'ভেরি গুড।' বুঝল রানা, ভেতরে ভেতরে পানি অনেকদূর গড়িয়েছে। 'এই বাড়িটা, এটা কার?'

'ওর চাচার,' মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল যুবক।

ও তখন প্রকাণ্ড এক ট্রেতে নানান খাবার সাজিয়ে ভেতরে ঢুকছে। চাদর খুলে রেখে এসেছে। নীল সালোয়ার-কামিজ আর সাদা ওড়নায় অপরূপ লাগছে দেখতে। জালাল বাড়ির প্রসঙ্গ তুলতে সে বলল, 'চিন্তার কিছু নেই। আমার চাচা এখানকার বড় মসজিদের ইমাম। চোখে কম দেখেন বলে মসজিদেই পড়ে থাকেন। তাঁর ছোট ছেলে সাথে থাকে, কিন্তু এখন সে নেই। আমি বেড়াতে এসেছি শুনে খুশি হয়েছেন চাচা, গত দু'দিনে এ মুখো হননি। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন আপনারা।'

কাবুল। একদিন আগের কথা। নিজের অফিসে বসে আছে কর্নেল নাজাফ মুরাদ। কপালে চিন্তার কুঞ্চন। সিলিং তাক্ করে কেন্টের

ধোঁয়া ছাড়ছে। অন্যমনস্ক চেহারা। আজ বড় খারাপ গেছে তার সকালটা।

ক্ষিপ্ত হাসান শাহ বরকতীর চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট নতি স্বীকার করেছেন আজ, তাকে যে সাতদিন সময় দেয়া হয়েছিল, তা বাতিল করে দিয়েছেন লোকটার চাপের মুখে। পারেননি তাকে ঠেকাতে। জেলারের খাতা চেক্ করে ঘটনা জেনে গেছে সে।

তার সোজা কথা, প্রেসিডেন্ট কোন আক্কেলে কর্নেলকে এমন এক কাজের অনুমতি দিলেন? কোন যুক্তিতে মুরাদ তাদের কাবুল থেকে সরিয়ে নিল, তাও বাঘলানের মত এক বর্ডার টাউনে? তালেবানরা পাহারা দিচ্ছে ওদের ভাল কথা, কিন্তু তারা যে পরীক্ষিত, ঈমানদার, তার নিশ্চয়তা কি? যদি টাকা খেয়ে ওদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করে ব্যাটারা? যদি পাকিস্তান বা রুশ বর্ডার দিয়ে ওপারে চলে যায় দুই স্পাই, তখন কি হবে?

শেষ পর্যন্ত কথা হয়েছে, মুরাদ তাদের একা জেরা করতে চায় করুক, সাতদিন কেন চোদ্দদিন লাগলেও ক্ষতি নেই, তবু ওদের কাবুল নিয়ে আসা হোক। তার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বরকতী নাক গলাবে না। কাজেই এরপর আর কথা চলে না। হাজার হোক মুরাদ সরকারের চাকর, আর বরকতী তাঁর মন্ত্রী। তাঁর সহযোদ্ধা, সরকারের একটা অঙ্গ।

সবচেয়ে বড় কথা, তালেবানদের মধ্যে তার সমর্থক একেবারে কম নেই। বেশি খেপে গেলে হয়তো অন্য ধরনের কিছু ঘটিয়ে বসতেও পারে। কি দরকার সেধে এত যন্ত্রণা ডেকে আনার? অতএব আজ মুরাদকে ডেকে দুই সাংবাদিককে নিয়ে আসতে বলে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। সে যা করতে চায় এখানে বসে করুক। রাজি না হয়ে উপায় কি কর্নেলের? তবে বলে-কয়ে আজকের রাতটা সময় নিয়েছে সে।

আজ স্পাই দুটোর মুখ খোলার শেষ চেষ্টা করবে। সফল হোক, বা না হোক, কাল সকালে তাদের ফেরত আনার ব্যবস্থা করবে।

এইডকে বারবার ডেস্কের সামনে ঘুরঘুর করতে দেখে বিরক্ত হলো কর্নেল। সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে বলল, 'কি চাও তুমি?'

'স্যার, অনেক ফাইল জমে গেছে,' IN ট্রে দেখিয়ে বলল তরুণ লেফটেন্যান্ট। 'কয়েকটা অন্তত ছেড়ে দেয়া গেলে ভাল হত।'

'হুঁম!' প্রথম ফাইল টেনে নিল সে। নাম দেখল, হামিদা গুলিস্তানী, অভিযোগ, সন্দেহভাজন বিশ্বাসঘাতক। আর কিছু দরকার হলো না, খস খস করে তার ডিটেনশন অর্ডারে সই করে দিল। লাঞ্চের আগে পর্যন্ত একটানা কাজ করে স্তূপ অর্ধেকে নামিয়ে আনল সে।

বাঘলান। পেট ঠাণ্ডা হতে ঘুমে চোখ বুজে এল রানা ও শহীদের। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে উঠে পড়ল ওরা, জালালের সাথে আলোচনা সেরে ঠা-ঠা রোদ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। হামিদার নির্দেশ করা পথ ধরে এগিয়ে দূর থেকে বাড়িটা দেখল।

একদম নদীর তীরে ওটা, চারতলা। চারদিকে বারো ফুট উঁচু দেয়াল। দেখেই বোঝা যায় ওপরের ফুটচারেক বেশিদিন হয়নি গাঁথা হয়েছে। তারওপর কাঁটাতারের বেড়া রোদে চকচক করছে। মেইন গেটে তিন তালেবান গার্ড দাঁড়িয়ে গল্প করছে, ঢিলেঢালা ভাবভঙ্গি। সামনের মেইনরোডের দু'পাশে বড় বড় পপলার গাছ। বাড়ির ভেতরেও বড় বাগান আছে মনে হলো। ছাদে সার্চলাইট।

দুই ক্লান্ত পথিকের মত একটু দূরের এক গাছের ছায়ায় বসে পড়ল রানা ও শহীদ। টুপি খুলে চোখেমুখে বাতাস করতে লাগল।

দেখা গেল আরও দুই গার্ড আছে বাড়িটার পিছনে। দেয়ালের ভেতরে সম্ভবত এক প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে নদীর দিকে নজর রাখছে। কাঁধ থেকে ওপরের অংশ দেখা যায় তাদের।

'বাড়িটা উপযুক্ত,' শহীদ বলল। 'কিন্তু সিকিউরিটি ব্যবস্থা তো তেমন মনে হয় না দেখে। গাছের আড়ালে আড়ালে গেট পর্যন্ত সহজেই পৌঁছে যেতে পারব আমরা, কি বলেন, রানা ভাই?'

মাথা দোলাল ও। 'নদীপথে আরও সহজ হবে মনে হয়।' আরও কিছুক্ষণ চোখ নেচে বেড়াল বাড়িটার ওপর। টেলিফোনের লাইন দেখতে পেয়ে সেদিকে ইশারায় শহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'সামনের পাওয়ার লাইন দেখতে পাচ্ছ?'

'জ্বি। দুটোই উড়িয়ে দিলে ভাল হয়।'

'চলো এবার। নদীর ওপারে গিয়ে পিছনদিকটা চেক্ করা যাক।'

শহরের দিকে চলল দু'জনে। নদী পারাপারের জন্যে রুশদের তৈরি বড় এক ঝুলন্ত ব্রিজ আছে, সেদিকে।

শহরের কাজ সেরে দক্ষিণ-পশ্চিমের খুদে বাঘলান ফাইটার বেজের দিকে চলল ওরা। ওটাও রুশদের তৈরি। এক সময় মোটামুটি ব্যস্ত ঘাঁটি ছিল, বর্তমানে কয়েকটা কপ্টার থাকে কেবল। ঠিক সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলে ওগুলোর ব্যবস্থা করা জরুরী। আড়ালে হোল্ডঅল থেকে বিমান বাহিনীর কভারল বের করে পরে নিয়ে এগোল ওরা।

রানা যা ভেবেছে, দেখা গেল তাই সত্যি। কপ্টার কয়েকটা আছে তবে গার্ড ব্যবস্থা একেবারেই ঢিলেঢালা। বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই বেজটার। লাঞ্চ সেরে হাটে ঝিম্ মেরে বসেছিল সিকিউরিটি গার্ড। কাশি শুনে চোখ মেলল, সামনেই দুই কভারল

পরা মেকানিক দেখে উঠে এল। 'আপনারা?'

তার ঘুম ঘুম চোখের সামনে নিজেদের আইডি তুলে ধরল দু'জনে। ভাল করে দেখলও না মানুষটা। 'কাবুল থেকে পাঠানো হয়েছে আমাদের,' রানা বলল। 'ভাল কন্ডিশনের কপ্টার কতগুলো আছে, তা চেক্ করে রিপোর্ট করতে হবে ওদের।'

'কিন্তু···আপনাদের চিনতে পারছি না কেন?' দ্বিধায় পড়ে ইতস্তত করতে লাগল গার্ড। 'আগে কখনও···'

কড়া চোখে তাকাল শহীদ। 'কানে কম শোনো নাকি তুমি? বলা হলো না কাবুল থেকে এসেছি আমরা?'

আর কথা বাড়াল না লোকটা, গেট খুলে দিল। এখানকার কর্মচারীদের ঢিলেমি ইত্যাদি নিয়ে গজগজ করতে করতে ভেতরে ঢুকল দু'জন। কপ্টার পার্কের দিকে এগোল। উল্টো ইউর মত টিনের শেডওয়ালা পার্কটা বেশ বড়। ভেতরে অনেকগুলো সোভিয়েত নির্মিত কপ্টার দেখা গেল, বেশিরভাগই অকেজো। ধুলোর পুরু স্তরের নিচে আসল চেহারা ঢাকা পড়ে গেছে।

ভেতরে এক লোকাল মেকানিককে পাওয়া গেল। সেও খেয়েদেয়ে এক দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে। লোকটাকে ডাকতে যাচ্ছিল শহীদ, কিন্তু দরকার হলো না, নিজে থেকেই ঘুম ভেঙে গেল তার। 'কারা আপনারা?' উঠে বসল সে।

আইডি দেখাল ওরা। রানা বলল আসার কারণ। শুনে মাথা নেড়ে হতাশা প্রকাশ করল মেকানিক। 'ওফ্, এই নিয়ে এবছর চারবার হলো। হেড অফিসের কাজের মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝি না। কেন যে বারবার···'

'ওসব নিয়ে পরে মাথা ঘামিয়ো, ভায়া,' শহীদ বলল। 'এখন দয়া করে দেখাও চালু কপ্টার কয়টা আছে। কোন্‌টা কোন্‌টা। কাজ সেরে আজই আমাদের কাবুল ফিরতে হবে।'

খাটিয়া ছেড়ে ওঠার কষ্ট করল না লোকটা, দূর থেকে আলাদা পার্ক করে রাখা গোটাছয়েক কপ্টার দেখিয়ে দিল। যত্নের সাথে ওগুলো পরীক্ষা করে দেখল শহীদ, রানা ওর হাতে ধরা ক্লিপবোর্ডে লিখল কি সব। কাজের সাথে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছে ওরা, যেন হতাশ হয়েছে এখানকার ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বহীনতা, রক্ষণাবেক্ষণে চরম অবহেলা ইত্যাদি দেখে।

ছটার মধ্যে পাঁচটা উড়ল, কিন্তু ওগুলোকে উড়ন্ত মৃত্যুফাঁদ বলে আখ্যা দিল শহীদ। একটামাত্র পাওয়া গেল ভরসা করার মত। একটা জেটরেঞ্জার, ফুয়েল ট্যাঙ্ক পুরো ভর্তি। ওটার ইগনাইটার প্লাগ খুলে কভারলের পকেটে ছেড়ে দিল শহীদ। মামলা ডিসমিস। আরও দু'তিন জায়গায় গেল ওরা, তারপর সন্তুষ্ট হলো পুরোপুরি।

আবার বিশ মাইল পাড়ি দিয়ে যখন অন্য দু'জনের সঙ্গে মিলিত হলো ওরা, তখন বেশ রাত। নির্ধারিত ১২০৫ মিনিটে থান্ডারবোল্ট ওয়ানের তরফ থেকে একটা হাই-স্পীড কোডেড মোর্স মেসেজ পেল দূরে অপেক্ষমাণ থান্ডারবোল্ট টু। ওটা এরকম: টুমরো নাইট প্ল্যান এ।

পঁয়তাল্লিশ মাইল দক্ষিণে আলালউদ্দিন খান পাঠানের বার্তা পিঙ্ক প্যান্থারের রেডিওতে রিসিভ করল করপোরাল সদরউদ্দিন। সন্ধে নামতেই মূল দলের সাথে যোগ দিতে রওয়ানা করল টু।

রাতে ঘুমাতে পারল না মাসুদ রানা। অস্বস্তিকর এক অনুভূতি জাগিয়ে রাখল ওকে। যে চ্যালেঞ্জ আসছে, তাকে মোকাবিলা করার চিন্তা অস্থির করে রাখল।

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রামত এল বটে, কিন্তু আলো ফুটতেই কেটে গেল রেশ। দুপুরে খেয়ে দু'জন দু'জন করে শহরের দিকে রওনা দিল দলটা। গাড়ি দুটো সঙ্গে নিল না। অস্থায়ী ঘাঁটিতে

নিরাপদেই থাকবে ওগুলো।

ছয়

রাত নেমেছে বাঘলানে।

ওদিকে শহরের ছয় মাইল দূরে, বনের মধ্যে থান্ডারবোল্ট টীম শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। গাঢ় সবুজ সালোয়ার-কুর্তার ওপর জলপাই রঙের বিশেষ ফিল্ড জ্যাকেট পরেছে সবাই। তালেবান গার্ডদের অফিশিয়াল ড্রেস এটা। দেখতে একইরকম হলেও ঢাকায় তৈরি এগুলোর বাড়তি কয়েকটা রিইনফোর্সড পকেট আছে।

ঢিলেঢালা করে কাটা হয়েছে জ্যাকেটের বগল যাতে প্রয়োজনের সময় হাত নাড়তে অসুবিধে না হয়। ওয়েবিং জ্যাকেটের বদলে কোমরে চওড়া বেল্ট পরল ওরা। বেল্টের সাথে ফিক্স করা আছে জলপাই রঙের প্লাস্টিক রেসপিরেটর কেস ও কয়েকটা পাউচ। মেডিকেল কিটস্, ইমার্জেন্সি শুকনো রেশন ও গোলাগুলি আছে ওগুলোয়। আর আছে দুটো করে ধাতব পানির বোতল।

এরপর সাইলেন্সারসহ পশ্চিম জার্মানীর হেকলার অ্যান্ড কচ জি-থ্রী কাঁধে ঝোলাল প্রত্যেকে। তালেবান গার্ডদের অস্ত্র ওটা। এবং একটা করে ব্রাউনিং অটো পিস্তল ও স্ট্যান্ডার্ড ফাইটিং নাইফ। আলালউদ্দিন ও জাফর আহমেদ সঙ্গে অতিরিক্ত নিল পাম্প-

অ্যাকশন রেমিংটন রিপিটার। পয়লা চোটে দরজার তালা ওড়াতে অথবা 'জনতা সামাল দিতে' দরকার হতে পারে ওগুলো।

ওজন যাতে বেশি না হয়ে পড়ে সেদিকে খেয়াল রেখে সবাইকে যথাসম্ভব অল্প ম্যাগাজিন সঙ্গে নিতে পরামর্শ দিল রানা। বেশি নেয়া অনর্থক, একজন এক্সপার্ট হাত চালিয়ে কাজ করলে কয়েক সেকেন্ডে শূন্য ম্যাগাজিন ভরে ফেলতে পারে। এরপর কয়েকটা করে এল-টু ফ্র্যাগমেন্টেশন, স্মোক বম্ব, ইলিউমিনেশন ফ্লেয়ার এবং স্টান গ্রেনেড তুলে নিল প্রত্যেকে। পাইলট শহীদের কাঁধে পড়ল বাড়তি ডজনখানেক পি ই-ফোর বিস্ফোরকের প্যাকেট ও ফিউজ। বোঝা বেশি হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ করল না সে। বরং ওগুলো কাজে লাগানোর সুযোগ পাবে কিনা, তাই নিয়ে লোকটাকে উদ্বিগ্ন মনে হলো।

একটা করে লাইট-ওয়েট ব্যাকপ্যাক নিল সবাই। ওর মধ্যে আছে ফ্লোটেশন ব্যাগ, টগল রোপ, ওয়্যার কাটার, দড়ি ও রাতে দেখার বিশেষ যন্ত্র আইডব্লিউএস স্টারলাইট স্কোপ, এবং একসেট করে সাধারণ পরিধেয়। সকাল হলে ওগুলোর দরকার হবে। দলের অবস্থানের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলা হলো মাটির বুক থেকে, নদীর তীরের নরম মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলা হলো।

এরপর শেষ আইটেম, রেডিও ও ভিএইচএফ পকেটফোন। বেজ টীমের সাথে কথা বলতে রেডিওটা নিল জাফর আহমেদ, আর সবার সাথে থাকল শর্ট ডিস্ট্যান্স কমিউনিকেশনের জন্যে টকিং ব্রচ–কলারে ফিট করা একটা থ্রোট মাইক ও খুদে রিসিভার ইয়ারপীস।

এবার রওয়ানা দেয়ার পালা। বনের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে ডাবল করে আধঘণ্টার মধ্যে বাঘলানের প্রান্তে পৌঁছল দলটা। আগের দিন দুপুরে রানা ও শহীদের বাছাই করে রেখে যাওয়া এক

গ্যারেজে পৌঁছল। এক মাইনিং কোম্পানির গ্যারেজ ওটা। ভেতরে একটা দেড় টনী সিমকা ট্রাক আছে ক্যানভাস কার্গো বডিওয়ালা, ওটাই ওদের টার্গেট। দারোয়ানকে বেঁধেছেঁদে ট্রাক বের করতে বেশি সময় লাগল না।

নিজস্ব কায়দায় ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ওটাকে স্টার্ট দিল মাসুদ রানা, দ্রুত চালিয়ে পৌঁছে গেল প্রথম টার্গেটে। বাঘলানের দক্ষিণ-পশ্চিমে মরুভূমির মধ্যে ওটা, বাঘলান কাবুল হাইওয়েতে। মূল টেলিফোন লিঙ্ক। জায়গামত পৌঁছে কাজে লেগে পড়ল শহীদ, ওটার সাথে সবুজ কার্ডবোর্ড কভার মোড়া পি ই-ফোর বিস্ফোরক বেঁধে ফিউজ সেট করল। ডায়ালে সময় বেঁধে দিল চার ঘণ্টা তিন মিনিট।

আফগানিস্তান সময় রাত সোয়া একটায় বাঘলানের সাথে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সম্পূর্ণ। এখানে কেয়ামত ঘটে গেলেও কাবুল জানবে না কিছু। কাজ শেষ হতে বড় এক লূপ তৈরি করে বাঘলান ফিরে চলল সিমকা। প্রায় এক ঘণ্টা লাগল জায়গামত পৌঁছতে। কান্দুজ হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক ড্যামের পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে ওটা—ওভারহেড পাওয়ার কেবল।

দৈত্যাকার স্টীল লেগের ওপর দিয়ে প্রথমে বাঘলানের দিকে গেছে ওটা, তারপর বিভিন্ন দিকে। লেগের দুই পায়ে দুই পি ই ফোর চার্জ বাঁধল শহীদ, ওপরের দুই ক্রস ব্রেসিঙেও। কাজ সেরে সন্তুষ্ট মনে নেমে এল সে। লাইনে যদি স্পার্ক না ঘটে, তাহলে ঠিক সময়ে যাবে লাইন। ঘটলে আগেভাগেই যাবে।

ঘড়ি দেখে মাথা ঝাঁকাল রানা। নির্ধারিত সময় এদিক-ওদিক হয়নি, একদম ঠিক আছে। 'সিনক্রোনাইজ করে নাও সবাই,' বলল ও। 'এগারোটা পঞ্চান্ন।'

কেউ কোন মন্তব্য করল না, নীরবে ঘড়ির কাঁটা অ্যাডজাস্ট

করে নিল।

'কার কি কাজ, মনে আছে সবার?'

জবাব দিল না কেউ। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একযোগে রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল নীরবে। সবার চেহারায় কাজ শুরু করার ব্যগ্রতা।

'কারও কোন প্রশ্ন নেই তাহলে?'

নেই।

মোহাম্মদ শহীদ ও জাফর আহমেদ ক্যামোফ্লেজ ক্রীমের টিউব নিয়ে কাজে লেগে পড়ল।

'মাত্র দু'জন আছে ব্যাটারা,' চাপা গলায় বলল জাফর। নদীর ওপারে বসে স্টারলাইট স্কোপ দিয়ে ভিলার সবুজ রঙের দুই চলমান সেমি-নেগেটিভের ওপর নজর রাখছে সে।

শহীদও দেখল। 'একটা ছাদে। অন্যটা পিছনের দেয়ালে।'

'হুঁম!'

ভিলার ছাদের গার্ড সার্চলাইট ঘুরিয়ে নজর বোলাতে লাগল চারদিকে। ওদের ওপর দিয়ে একবার ঘুরে গেল শক্তিশালী বীম, কয়েক মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টিশক্তি হারাল ওদের শাফটিস্কোপ। নব ঘুরিয়ে নিজের স্কোপ অফ করে দিল জাফর, সার্বক্ষণিক মৃদু গুঞ্জন থেমে গেল। ওটাকে কোমরের বেল্টের সাথে ক্লিপে ঝোলানো ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে ভরে ফেলল সে। বিড়বিড় করে বলল, 'হারামজাদারা ঘুমাতে যায় না কেন?'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল শহীদের। 'যাবে। আগে তোমাকে রোস্ট বানিয়ে।'

'আমি রেডি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল সে। 'ওরা স্টিক আর পিট তৈরি করলেই,' কথা শেষ না করে পানিতে আঙুল চোবাল সে,

লাফিয়ে উঠল পরমুহূর্তে। '...ওরে বাবা, কী ঠাণ্ডা!'

'স্রোত কিরকম?'

'আছে মোটামুটি।' ব্যাকপ্যাক থেকে কালো নাইলনের দড়ির কয়েল বের করল জাফর, একমাথা পানির ধারঘেঁষা একটা উইলো গাছের গোড়ায় মজবুত করে বাঁধল, অন্য মাথা কোমরের হার্নেস বেল্টে। এরপর ব্যাকপ্যাক, হেকলার অ্যান্ড কচ ও ব্রাউনিং, সব ফ্লোটেশন ব্যাগে ভরে ফেলল।

প্যারাস্যুট অ্যাঙ্কেল বুট পরা এক পা পানিতে নামিয়ে থামল কি ভেবে। 'যদি পানিতে ভিজে আমার ফোন অকেজো হয়ে যায়, দড়িতে তিনটা টান দেব।'

'চেক্,' মাথা ঝাঁকাল শহীদ। উইলো গাছে হেলান দিয়ে লাইনটা মুঠো করে ধরল। সঙ্গীর প্রয়োজন অনুযায়ী ঢিল দেবে ওতে।

গলা পর্যন্ত নামল সে, তারপর নিঃশব্দে ভেসে পড়ল। মৃদু স্রোতে গা ভাসিয়ে ওপারের দিকে চলল ফ্লোটেশন ব্যাগ সামনে ধরে। বছরের এই সময় পানি বেশ কম থাকে কান্দুজে। এতই কম যে কয়েক জায়গায় হাঁটু আর হাতের ওপর ভর করে এগোতে হলো ওকে। ঠাণ্ডা পানি, শীত লাগছে। কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় সতর্ক আছে বলে অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন করছে দেহ, তাই ব্যাপারটা তেমন টের পাচ্ছে না জাফর। সমস্যা যা একটু ঘটাল ভারী বুট, আর কোন অসুবিধে হলো না।

দশ মিনিটে অন্য তীরের বুক পানিতে পৌঁছে থামল সে, এরমধ্যে কান্দুজ এখানটায় কত চওড়া সে হিসেব হয়ে গেছে। একশো পঁচিশ গজের মত। খুব সতর্কতার সাথে পানি ছেড়ে উঠে পড়ল, বাড়িটার একশো গজ দূরের মোটা কাণ্ডের এক গাছের আড়ালে বসল। মুহূর্তে হাতে চলে এসেছে সাব-মেশিনগান, একই

সাথে টার্গেটে পৌঁছার সহজ ও সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথের খোঁজে তাকাল সে।

ওদিকে আর কারও নড়াচড়া দেখল না জাফর। গার্ড দু'জনই আছে। হেভিডিউটি সার্চ লাইট আগের মতই চক্কর মেরে বেড়াচ্ছে নদীর ওপর। কাছ থেকে লোক দুটোকে খুবই অসতর্ক মনে হলো তার। অসাবধান, এবং অপেশাদার। মনে মনে হাসল জাফর, ভালই হলো।

এত কাছ থেকে ফোনে কথা বলতে ভরসা হলো না বলে দড়ি ধরে পরপর তিনটে টান দিল ও। একটু পর দড়িতে পাল্টা টান পড়ল। ওটা ধরেই আসছে শহীদ। এবং সাত মিনিটে পৌঁছে গেল পাইলট। ব্যাগ থেকে প্রয়োজনীয় সব বের করে তৈরি হয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে।

'চলো এবার।'

তীর ঘেঁষে সন্তর্পণে এগোল ওরা। পা বাড়াবার আগে ঘড়ি দেখে নিয়েছে দু'জনেই–একটা কুড়ি। আর পঁচিশ মিনিট সময় আছে। পা দিয়ে মাটি-পাথর টিপে টিপে এগোচ্ছে ওরা, হেকলার রেডি। মাথার ওপর আকাশ ঢেকে রাখা প্রচণ্ড ছাতার মত পপলার গাছ মৃদু বাতাসে দুলছে, সরসর আওয়াজ করছে।

ভিলার দেয়ালের ভেতরে কেউ কেশে উঠল। চেনা-অচেনা গানের পোকাদের ঐকতানে ছন্দপতন ঘটাল আওয়াজটা। একটু থমকাল, খানিক বেসুরো বাজল, তারপর আবার ছন্দ খুঁজে পেল ওদের তান। বেড়ে চলল আওয়াজ।

জায়গামত পৌঁছে বসে পড়ল শহীদ ও জাফর। ঘড়ি দেখল–দেড়টা। আরও পনেরো মিনিট।

আচরণ দেখে যতটা মনে হয়, ইরাজ আসলে তার সিকি ভাগ

রাগীও নয়। ভেতরে ভেতরে বরং অনেক শান্ত, নির্বিরোধী মানুষ। সাধারণ।

মোটামুটি লিখতে-পড়তে জানে বলে একটু গর্ব অবশ্যই আছে মনে, কারণ বেশিরভাগ আফগান হচ্ছে বকলম। তাদের তুলনায় সে ব্যতিক্রম, গর্ব হবে না কেন? তবে বুদ্ধি একটু কম, এই যা। এই জন্যেই তালেবান মোল্লারা যখন ধর্মের নামে ক্ষমতা দখলের ডাক দিল, চট্ করে ভিড়ে গেল তাদের সাথে। জান বাজী রেখে মুজাহেদিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করল, ক্ষমতা দখলে সাহায্য করল বর্তমান সরকারকে, তাদের হয়ে খুন-খারাবিও কম করেনি।

ওসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি ইরাজ। মাথা ঘামানোর কথা মাথায়ই আসেনি আসলে। মোল্লারা বলেছে, অমুককে মেরে রেখে এসো, কি অমুক পরিবারের সবাইকে ঘরে বন্দী করে আগুন ধরিয়ে দাও ঘরে, সে তাই করেছে সরল মনে। যারা তার হুকুমদার, ইরাজ জানে তারা অনেক লেখাপড়া জানা। না বুঝে কোন হুকুম দেয় না।

কিন্তু আজ ব্যাপারটা অন্যরকম ঠেকছে তার। অভিযোগ প্রমাণ না হতে কোন বিদেশী নাগরিককে এত হেনস্তা করা হয়, তাও একজন মহিলাসহ, এই প্রথম জানল সে। ওরা কি এমন ক্ষতিকর জিনিস পাচার করছিল? কারেমি কি দিতে গিয়েছিল ওদের? এয়ারপোর্ট থেকে ধরে ক'দিন কাবুলে রাখা হলো, ওখান থেকে নিয়ে আসা হলো এখানে, ফের কাবুল! কেন?

কর্নেল মুরাদের যে মেসেজ এসেছে আজ, তাতে বলা হয়েছে, এই দুই সাংবাদিক যুগলের মুখ খোলাবার শেষ চেষ্টা করতে আজ রাতে সে আসছে। সে জন্যে নির্যাতনের যে সমস্ত যন্ত্রপাতি রেডি রাখতে বলা হয়েছে মেসেজে, তা জেনে রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছে ইরাজ। ওগুলো রুশদের আমদানী করা ডিভাইস, কয়েক

বছর আগে আফগানদের ওপরই ব্যবহার করা হত।

সে জানে, ওগুলো যদি সত্যিই ব্যবহার করা হয়, সকালের সূর্য দেখার জন্যে কেউ বেঁচে থাকবে না ওরা। বেঁচে থাকলেও দেখবে না, কারণ ওদের জান তখন ঠোঁটের ডগায় থাকবে। সোজা কথায় মেরেই ফেলা হবে, সে এখানেই হোক, কি কাবুলে। ভাল কথা, তাই যদি হবে, তাহলে মৃত্যুপথ যাত্রীদের শেষ মুহূর্তের যে সুযোগ-সুবিধে দেয়ার বিধান আছে, এদের তা দেয়া উচিত ছিল না কি? কেন শুধু শুধু কষ্ট দেয়া হচ্ছে খাবার-কম্বলের সুবিধে থেকে বঞ্চিত করে? কেন আলাদা সেলে রাখা হয়েছে দু'জনকে?

ভাবতে ভাবতে কথাটা মনে পড়ল ইরাজের, মেয়েটাকে এক কাপ গরম চা বানিয়ে দিলে কেমন হয়? ভালই হয়, কিছুটা তো গা গরম হবে বেচারীর! নিজেরও খুব তেষ্টা পেয়েছে, একসাথে দু'কাপ...পা বাড়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় দপ্ করে সমস্ত আলো নিভে গেল। 'ধুশ্ শালা!' বিড় বিড় করে উঠল ইরাজ।

ছাদের সার্চলাইটও গেল একই মুহূর্তে। তীব্র নীলচে আলোর বীম হঠাৎ ঝপ্ করে তেজ হারাল, পরক্ষণে নেই হয়ে গেল লালচে আভার ঝলক দেখিয়ে। পশতু ভাষার কয়েকটা কণ্ঠের হতাশাসূচক ধ্বনি ভেসে এল শহীদ ও জাফরের কানে। একটু পর কারও হোঁচট খাওয়া এবং জঘন্য মুখ খিস্তি। ওদের ট্রেনিং পাওয়া কান অনেক দূর থেকে আসা বিস্ফোরণের চাপা আওয়াজও শুনল। পুরো বাঘলান ডুবে গেল গাঢ় অন্ধকারে।

এক সেকেন্ড পর পকেটফোনে রানার গম্ভীর নির্দেশ শুনল ওরা, 'গো!'

'রজার,' জবাব দিল শহীদ। জাফরের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল, 'চলো।'

ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে চলল দু'জনে, খাড়া তীর

বেয়ে দ্রুত ওপরে উঠে দীর্ঘ ঘাসের মধ্যে ঢুকে আবার এগোল। হাত মুখ ক্রীম মেখে কালো করে ফেলা হয়েছে, পরিধেয় সবকিছুর রঙ গাঢ়, অন্য সব উজ্জ্বল সারফেস কালো ম্যাট ইনসুলেশন টেপে ঢাকা, ধাতব যা কিছু, সব এমনভাবে দেহের এখানে-ওখানে ঝোলানো হয়েছে যাতে ঠোকাঠুকি লেগে শব্দ না ওঠে, কাজেই নির্ভয়ে মাঝের দূরত্ব পেরিয়ে পিছনের বারো ফুট উঁচু দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেল ওরা অল্পক্ষণের মধ্যে।

বসে জিরিয়ে নিল কিছু সময়। উত্তেজনা আর পরিশ্রমে ঘেমে গোসল। ঢপ্-ঢপ্ করছে হৃৎপিণ্ড। সামলে নিয়ে এক হাঁটু গেড়ে বসল শহীদ, সাইলেন্সার লাগানো হেকলারের দীর্ঘ নল তুলল দেয়ালের যেদিকে গার্ড অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম আছে, সেদিকে। জায়গাটা ওদের ডানে, চল্লিশ ফুট দূরে। তখনই দেয়ালের আরেক মাথা থেকে কয়েকটা কণ্ঠ কথা বলে উঠল অস্ফুটে। কান পাতল সার্জেন্ট। মর জ্বালা!

হাত তুলে তিন আঙুল খাড়া করে জাফরকে দেখাল সে, বুড়ো আঙুল বাঁকা করে উল্টোদিক ইঙ্গিত করল। বিরক্তিতে নাক কোঁচকাল জাফর। বুড়ো আঙুল দেখাল এবার শহীদ, তারপর দু'জনে মিলে লেগে পড়ল খাগড়াছড়িতে বহুবার প্র্যাকটিস করা রুটিন অ্যাকশনে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দু'হাতের আঙুল পরস্পরের মধ্যে ভরে হাঁটু গেড়ে বসল সার্জেন্ট। জাফর তার ওপর এক পা রেখে দাঁড়াতে তাকেসহ উঠে পড়ল।

এবার তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরটা মোটামুটি দেখতে পেল জাফর। ওর কয়েক গজ বাঁয়ে, দেয়ালের চার ফুট নিচে রয়েছে কাঠের তৈরি এক ভাসমান অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম, ওপরে চালাও আছে। ডানেও আছে প্লাটফর্ম, তবে ওটা ফাঁকা। তিনটে ছায়া দেখা যাচ্ছে বাঁদিকেরটায়, আবছামত। গল্প করছে, সিগারেট

ফুঁকছে। ওদের অবস্থান ঠিকমত বুঝে না ওঠা পর্যন্ত সেদিক থেকে নজর সরাল না সে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল ব্যাপারটা–দুটো কাঠামো সরাসরি এদিকে পিছন ফিরে বসে আছে, অন্যটা পাশ ফিরে। ভিলা দেয়াল থেকে কম করেও একশো গজ ভেতরে।

অবস্থা বুঝে তৎক্ষণাৎ তারকাঁটার বেড়া না কাটার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জাফর। অনেক কাছে রয়েছে গার্ডরা, ক্লিপিঙের আওয়াজ যদি না-ও শোনে, বিচ্ছিন্ন হওয়ামাত্র শূন্যে তারের মোচড় খাওয়া নিশ্চয়ই দেখে ফেলবে। অতএব? শহীদের মাথায় চাঁটি মেরে ওকে বসতে বলল সে ইশারায়, নেমে পড়ল মাটিতে। ভেতরের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে এক মিনিট পর ফের উঠল, এবার শহীদের দু'কাঁধে পা রেখে।

দু'হাতে দুই কনুইয়ের ওপরটা শক্ত করে ধরল শহীদ, তারপর হাত তুলে দেয়ালের গায়ে নিজের ভর চাপিয়ে দাঁড়াল যাতে কাঁধ স্বাভাবিকের চাইতে সামান্য চওড়া হয়, জাফর তার বাহুর পাকানো পেশীর ওপর দাঁড়াতে পারে। এতে দু'জনেরই সুবিধে। আগের তুলনায় উচ্চতা বেশি হওয়ায় এবার আরও ভাল করে ভেতরটা দেখতে পেল জাফর। এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে হেকলারের বাঁট কাঁধে ঠেকিয়ে তৈরি হলো।

তখনই পিছন ফিরে বসা দু'জনের একজন শব্দ করে হেসে উঠল। সুযোগটা মিস করল না জাফর, হাসির আওয়াজ কাজে লাগিয়ে তার পাশেরটার বাঁ পিঠ সই করে গুলি করল। ফুট! ফুট!

হোঁচট খেল সঙ্গীর হাসি, হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকা দেহটা ধরতে যাচ্ছিল সে, পরক্ষণে আবার ফুট! ফুট! অবস্থা বেগতিক, টের পেল ঠিকই তৃতীয়জন, চ্যাঁচাবার জন্যে মুখ খুলেওছিল, কিন্তু ওই পর্যন্তই। জাফরের পঞ্চম গুলি চোয়াল গুঁড়িয়ে দিল তার, পরেরটার ধাক্কায় খুলিসহ উড়ে গেল ঘিলু। একটার ওপর

আরেকটা লাশ গড়িয়ে পড়ল। একটা জ্বলন্ত সিগারেট গড়িয়ে পড়ল নিচে।

'ফিনিশ্!' পিছন ফিরে ফিস্‌ফিস্ করে বলল জাফর। হেকলার দেয়ালের ওপর রেখে নিজেও উঠে পড়ল। এক মিনিট পর টগ্‌ল রোপ বেয়ে উঠল শহীদ। ছয় ফুটী টগল রোপের এক মাথায় লোহার রাবার পরানো হুক, এবং তিন ফুট পর পর কাঠের চার ইঞ্চি পা দানি আছে, দড়ির দু'দিকে দু'ইঞ্চি করে বেরিয়ে থাকে। প্রয়োজনে ওরকম কয়েকটা জুড়ে যতদূর প্রয়োজন ওঠা-নামা করা সম্ভব।

কাঁটার বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে নেমে পড়ল ওরা। দু'জনেই সন্তুষ্ট। ঝামেলা গেছে, কেটে পড়ার রাস্তাও পরিষ্কার হয়েছে। ছাদে হেঁটে বেড়ানো গার্ডটাকে দেখাল জাফর। 'এখান থেকেই ওটাকে নিলে হত না?'

মাথা নাড়ল পাইলট। 'অন্ধকারে এত দূরের টার্গেটকে গুলি করার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। এখানে থাকো তুমি। আমি আসছি ওর ব্যবস্থা করে।' দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ওদিকে ছাদের নিঃসঙ্গ গার্ডের যেমন পেয়েছে খিদে, তেমনি করছে শীত। এক সময় রেগুলার ছিল সে। বহু রুশ সৈন্য মেরেছে নিজ হাতে। আগের সরকারের সময় নিয়ম অনুযায়ী অবসর দেয়া হয়েছিল তাকে, কিন্তু কর্নেল মুরাদ আবার ডেকে এনে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। কাবুলে অল্প কিছুদিন কাজ করার পর এখানে বদলি করেছে এই দুই বিদেশী সাংবাদিককে পাহারা দেয়ার জন্যে। সে এই কাজে খুশি। বিদেশী স্পাইদের গার্ড দেয়ার মর্যাদাই আলাদা।

শীত তাড়াবার জন্যে পা ঠুকল গার্ড, দু'হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে তালু ঘষল। ভিলার পিছনদিকের দুই প্ল্যাটফর্মের দিকে চোখ

কুঁচকে তাকিয়ে ভাবল, ব্যাটারা করছেটা কি? টর্চলাইট জ্বেলে দেখলেও তো পারে। হারামজাদা কারেন্টই বা কতক্ষণে আসবে? সারা শহর অন্ধকার, তার মানে মেজর ফল্ট। ওভারলোড, ভাবল সে, ঠিক তাই।

মুখ তুলে তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকাল, তখনই চল্লিশ ফুট নিচের বাগানের পথ দিয়ে একটা ছায়া নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ভিলার এক পাশের ড্রেনেজ পাইপের দিকে। মুখ নামিয়ে নিজেকে দু'হাতে আলিঙ্গন করে পায়চারি শুরু করল গার্ড। প্রতিবার পা ফেলার সময় নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, কাল বাড়তি জার্সি পরে নিতে হবে। এত ঠাণ্ডায় একটা জার্সিতে কাজ হয় না।

ছাদের একমাথায় পৌঁছে অ্যাবাউট টার্ন করল সে, ও মাথার দিকে পা বাড়াল। কয়েক পা যেতেই সামনে ঠুক্ করে একটা আওয়াজ হতে থেমে পড়ল–কিসের শব্দ? ইঁদুর নাকি? ছাদে ইঁদুর? না পাখি? চোখ কুঁচকে আরও এক পা এগোল। না অন্য কিছু?

ওটাই ছিল তার জীবনের শেষ ভাবনা।

নুড়িটা ছুঁড়ে পিছনে তৈরি হয়ে বসে ছিল পাইলট, শব্দে আকৃষ্ট হয়ে গার্ড সামনের দিকে যাবে জেনে নিশ্চিত ছিল। ঘটলও তাই। এবং তিন পা যেতে না যেতে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল সে। এক হাতে পিছন থেকে মুখ চেপে ধরে অন্য হাতে ফাইটিং ছুরি চালাল। থুতনির নিচ দিয়ে সুচালো ব্লেড ঢোকার সময় একটু ব্যথা হলো বটে, কিন্তু ওটা মগজে ঢুকে পড়তে আর কোন যন্ত্রণা থাকল না।

পলকে চিরঘুমে তলিয়ে গেল গার্ড। লাশটা আস্তে শুইয়ে দিল শহীদ। ঠোঁট নড়ে উঠল ওর। 'ওয়ান টু থান্ডারবোল্ট লীডার। ইন পজিশন। ওভার।'

ভিলার সামান্য দূরের এক সাইড রোডে অন্য এক চোরাই গাড়িতে বসে আছে রানা ও অন্যরা। পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে সিমকা আরেক সাইড রোডে বিসর্জন দিয়ে এটা হাতিয়েছে। একটা টয়োটা পিক্‌আপ এটা।

শহীদের রিপোর্ট শুনে হাসি ফুটল রানার মুখে। ওকে হাসতে দেখে ড্রাইভারের সীটে বসা আলালউদ্দিনও হাসল।

'ভিলার তিনতলায় একটা আলো দেখা যাচ্ছে,' বলল রানা। 'ওটা কিসের আলো? ওভার।'

'রেডিও রূম ওটা, হ্যারিকেন জ্বেলে কাজ করছে ব্যাটারা। ওপরে ওঠার সময় দেখেছি। ওটার এরিয়াল ছাদে। ওভার।'

কিছুসময় ভাবল রানা। ভিলার ভেতরের লেআউট জানা নেই ওদের কারও। জিম্মি দু'জনকে কোথায় রাখা হয়েছে, তাও অজানা। তবে অনুমান করা যায় হয় চিলেকোঠায়, নয়তো বেজমেন্ট রূমে রাখা হয়েছে ওদের। একজন গার্ড অন্তত থাকবে তাদের সেলের পাহারায়। এবং তার কাছেও নিঃসন্দেহে একটা হ্যারিকেন থাকবে রেডিও রূমের মত। গুড! দ্বিতীয় আলো যেখানে দেখা যাবে, সেখানেই প্রথম হানা দেবে ওরা। মন বলছে বন্দী দু'জনকে বেজমেন্টেই রাখা হয়েছে।

'প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করে যাও, ওয়ান,' বলল রানা। 'সম্ভবত স্ট্রীট লেভেলের নিচে আছে আমাদের টার্গেট। থান্ডারবোল্ট টু?'

'ইয়েস, বস্!'

'ব্যাক ডোরের কাছে পজিশন নাও। আমরা আসছি।'

'ওকে, বস্!'

'ওয়ান, ওদের রেডিও অফ করে দাও। আউট।'

হাসি ফুটল পাইলটের মুখে। ঝোলা থেকে বারো ইঞ্চি দীর্ঘ একটা শেরমালি প্যারা-ইলাম ফ্লেয়ার বের করে যে চিমনি দিয়ে

ধোঁয়া বের হচ্ছে, তার পাশে রাখল। তারপর বের করল একটা এইটথ্রী স্মোক গ্রেনেড। বিস্ফোরিত হলে অনবরত নীল, ঘন কুয়াশার মত গ্যাস বের হয় ওর মধ্যে থেকে। হুলস্থুলের সময় ডবল হুলস্থুল বাধাতে জিনিসটার জুড়ি নেই।

চিমনির খোলামুখে এক হাতে ফ্লেয়ার ধরে অন্যহাতে ওটার পুল-লূপ টেনে খুলেই ছেড়ে দিল শহীদ, আচমকা বিকট 'হুশশ্!' আওয়াজ উঠল, চিমনির ভেতরটা আলো করে রকেটের বেগে নিচের দিকে ছুটল ওটা। বিস্ফোরিত হলো আগুনে পড়ে। ছিট্‌কে উঠে সারাঘরে ছড়িয়ে পড়ল আগুন। ভেতরের অবস্থা কল্পনা করে মনে মনে হাসল পাইলট, স্মোক গ্রেনেডটাও ছেড়ে দিল।

তারপর পাইপ বেয়ে রওয়ানা হলো নিচের দিকে। তার আগে রেডিওর এরিয়াল কেব্‌ল্ কেটে দিতে ভুল হলো না।

অনেক দেরি হয়ে গেছে কর্নেল মুরাদের। অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রচুর কাজ জমে ছিল অফিসে, সেসব সেরে উঠতেই সন্ধে হয়ে গেল। তারপর যখন বের হতে যাবে, তখনই এসে হাজির হাসান শাহ্ বরকতী। মিষ্টি মিষ্টি কথায় অনেকক্ষণ ধরে তাকে নসিহত করে গেছে মানুষটা।

সে সবের সার কথা বুঝে নিতে কষ্ট হয়নি মুরাদের। সোজা কথায় সে তাকে ভবিষ্যতে দেখে নেবে বলে হুমকি দিয়ে গেছে। তার শিকার কেড়ে নেয়ার যে দুঃসাহস দেখিয়েছে কর্নেল, আগামীতে সে জন্যে কঠিন মূল্য দিতে হবে বলে আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। সেই সাথে মনে করিয়ে দিয়ে গেছে যেন কাল সূর্য ওঠার আগে দুই বাংলাদেশী স্পাইকে অবশ্যই কাবুলে ফিরিয়ে আনে সে।

যন্ত্রণার ওপর যন্ত্রণা! ব্যক্তিগত কপ্টারে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো

যাবে ভেবে এয়ারপোর্টে গিয়ে খেয়েছে আরেক ধাক্কা। ঠিক ওড়ার আগমুহূর্তে এঞ্জিনে ঝামেলা দেখা দিল। অস্থির, অধৈর্য মুরাদ যতবার পাইলটকে জিজ্ঞেস করেছে, 'সারতে আর কত সময় লাগবে?' ব্যাটা ততবার একই জবাব দিয়েছে, 'এই তো, স্যার, পাঁচ মিনিট।'

শেষ পর্যন্ত লেগেছে চার ঘণ্টা। এমন হবে জানলে গাড়িতেই চলে আসত সে। বেগতিক দেখে মিলিটারি বেজের ইন-চার্জের কাছে আর্মির একটা কপ্টার ধার চেয়েছিল মুরাদ, দিল না শালার মোল্লা। একেবারে মুখের ওপর না করে দিল। থাকত যদি সে আজ আর্মিতে, হারামজাদার অন স্পট কোর্টমার্শাল করে তবে ছাড়ত। আধা ডুবে যাওয়া দেশটাকে পুরো ডোবাবে এই শালারা, তাতে কোন সন্দেহ নেই মুরাদের। সে যা হোক, অবশেষে সোয়া একটায় নিজের কপ্টার নিয়েই আকাশে উড়েছে কর্নেল। রাত আর বেশি নেই জানে, বন্দীদের জেরা করার প্রয়োজনীয় সময় পাবে না, তাও জানে। কাজেই সপ্তমে চড়ে আছে মেজাজ।

নিচের অন্ধকার শেষ হয় না দেখে একসময় আবার ধৈর্য হারাল সে, পার্সপেক্সের স্বচ্ছ ক্যানোপিতে জোরে কয়েকবার আওয়াজ করে পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'কি হলো, ভুল করে সাহারায় নিয়ে আসোনি তো আবার?'

'না, স্যার, কর্নেল।'

'তাহলে? কোথায় গেল বাঘলান! এত অন্ধকার কেন নিচে?'

চুপ করে থাকল লোকটা, ভয়ে ঘামছে। তার ধারণা কর্নেল এবার নির্ঘাত মেরে-টেরে বসবে।

'কথা বলছ না কেন?'- রোটরের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল তার হুঙ্কার।

'স্যার, মনে হয় কারেন্ট ফেল করেছে বাঘলানের। শহর,

এয়ারপোর্ট কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

আবার হুঙ্কার ছাড়তে যাচ্ছিল মুরাদ, কিন্তু ততক্ষণে বাঘলান বেজের সাথে কথা বলার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লোকটা। অবশেষে কাজ হলো, মিনিট দুয়েক পর সাড়া দিল ওরা। কর্নেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল দু'হাজার ফুট নিচে এমার্জেন্সি জেনারেটর চালিত রানওয়ে ও টার্মিনাল ভবনের আলো জ্বলে উঠেছে দেখে।

ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির দিকে তাকাল। ঠিক পৌনে দুটো বাজে।' 'জলদি করো!' বলল সে ব্যগ্র কণ্ঠে। 'জলদি নামাও হারামজাদাকে!'

সাত

'আগুন! আগুন!' কে যেন চেঁচিয়ে উঠল বাইরে।

ডনের বেজমেন্ট সেল থেকে চিৎকারটা আলি শুনল ঠিকই, তবে গায়ে মাখল না। দূর! কিসের আগুন? নিজের কাজ করে যেতে থাকল সে, পিঠ খাড়া চেয়ারের হাতল আর পায়ার সাথে মনের সুখে কষে বাঁধছে সাংবাদিককে।

আবার উঠল চিৎকার, এবার কয়েকটা কণ্ঠে। সঙ্গে ছোটাছুটির আওয়াজ। দেখতে দেখতে হুলস্থুল শুরু হয়ে গেল বাইরে। চারদিক থেকে 'আগুন! আগুন!' চিৎকার আসছে। মনে হচ্ছে গোটা হিন্দুকুশ ধসে পড়েছে বুঝি ভিলার মাথায়।

কি মুশকিল! কর্নেল মুরাদ আসছেন, এখন এ দুটোকে

ইন্টারোগেশনের জন্যে রেডি করতে হবে, আর ওদিকে কি না···সেলের স্টীলের দরজায় ধুম্ ধুম্ কিলের আওয়াজে সিধে হলো আলি। 'অ্যাই, কে ওখানে? কি হয়েছে?' হাঁক ছাড়ল।

করিডরের দৌড়ঝাঁপ আরও বেড়ে গেছে টের পেল সে। গাঢ় অন্ধকারে এ ওর গায়ের ওপর পড়ছে। চিৎকার, ডাকাডাকি, হুড়োহুড়িতে মহা বিশৃঙ্খল অবস্থা। কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল আলি। 'কে ওখানে?'

জবাব এল, 'আগুন!' আলি নাক টানল। হ্যাঁ, সত্যি, ধোঁয়ার গন্ধ আসছে।

'অ্যাই, গেট খোলো!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'বেরোতে দাও আমাকে!'

দোজখে বা পৃথিবীতে, কোথাও পুড়ে মরার ইচ্ছে নেই তার। তাও সেলে আটকে পড়া ইঁদুরের মত। গেটের চাবি যার কাছে থাকে, তার নাম ধরে কয়েকটা হাঁক ছাড়ল সে। শুনল লোকটা। তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ উঠল, পরক্ষণে ঘটাং শব্দে দরজা খুলে গেল। আশ্বস্ত হলো আলি। 'কি হয়েছে?'

'কিচেনে আগুন ধরে গেছে,' হড়বড় করে বলল গার্ড। 'চায়ের ভ্যাট ফেটে গেছে হঠাৎ করে।' সেলের হ্যারিকেনটা দেখাল ইঙ্গিতে। 'ওটা দেবে কিছুক্ষণের জন্যে? দেখে আসি কি হলো। শালার অন্ধকারে···'

'না না, ওটা দেয়া যাবে না। আমি এখানে···'

বেজমেন্টের সিঁড়ির মাথায় ঝোলানো একটা পেতলের ঘণ্টী সশব্দে বেজে উঠতে থমকে মুখ তুলল সে। গার্ডের দিকে তাকাল। 'নিশ্চই কর্নেল সাহেব! জলদি গেট খুলে দিয়ে এসো। দেরি হলে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন কর্নেল। কুক হারামজাদাকে বলো আগুন নেভাতে।'

হোঁচট খেতে খেতে ছুটল গার্ড, করিডরের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা আরও দুই হতভম্ব গার্ডকে নিয়ে মেইন গেটের দিকে এগোল। ধোঁয়ায় চোখে পানি এসে গেছে, কিছু দেখতে পাচ্ছে না কেউ। হাঁটার ফাঁকে কাঁধ থেকে জিথ্রী নামাল লোকটা, ব্যস্ত হাতে বোল্ট সরিয়ে ভারী গেট টেনে খুলে দিল।

সামনেই কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা অচেনা এক মোল্লাকে দেখে চোখ কুঁচকে উঠল তার। লোকটার সঙ্গীও আরেক মোল্লা, তবে বেশ ছোটখাট।

ধোঁয়া লাগায় চোখ কোঁচকাল দীর্ঘদেহী মোল্লা। 'কি হচ্ছে এখানে?' ভরাট, গম্ভীর গলায় চার্জ করল।

'আ-আগুন...'

'আগুন!' গর্জে উঠল রানা। 'কোথায়? বন্দীদের কি অবস্থা?'

'ভা-ভাল, স্যার! স্যার, আপনি?'

'ওটা সরাও, আহাম্মক কোথাকার!' ধমকে উঠল ও তার জিথ্রী দেখিয়ে। 'অস্ত্র কাদের দিকে ধরতে হয় এখনও শেখোনি নাকি?' বলতে বলতে ঢুকে পড়ল ভেতরে। আলালউদ্দিনও গুটগুট করে ঢুকে পড়ল ওর পিছু পিছু।

গার্ড ব্যাটা ভড়কালেও নিজের দায়িত্ব ভোলেনি। বাইরে আর কাউকে না দেখে কিছুটা অবাক হলো। 'আপনারা মাত্র দু'জন? কর্নেল মুরাদ কোথায়?'

'উনি আসছেন। কিন্তু সর্বনাশ, এসব কি ঘটিয়ে বসছ তোমরা! কর্নেল এসে দেখলে তো...আবার দেখো কেমন উজবুকের মত দাঁড়িয়ে আছে!' চেহারা বিগড়ে গেল রানার। 'গেট খুলে রেখেছ কি মনে করে, গাধার দল! বন্ধ করো! ধোঁয়ার আড়ালে বন্দীরা যদি পালায় গুষ্ঠিসহ মরতে হবে তোমাদের, তা জানো?'

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল গেট। 'স্যার আপনি বন্দীদের কথা জানেন?' ওর পথ বন্ধ করে দাঁড়াল গার্ড।

'অবশ্যই!'

'কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারছি না! আগে কখনও দেখিনি!'

'না দেখে থাকলে চিনবে কি করে, হাঁদারাম?' মাথার ঝাঁকির সাথে নকল দাড়ি দুলে উঠল ওর। 'হোসেন শাহ্ বরকতীর নাম শুনেছ?'

একটু বিস্ময়, একটু শ্রদ্ধা ফুটল গার্ডের চেহারায়। 'নিশ্চয়ই, স্যার। কিন্তু আপনাকে তো তাঁর মত লাগছে না!'

'লাগার কথা নয়, কারণ আমি সে নই। আমি তার ভাই।'

চট্ করে পথ থেকে সরে গেল গার্ড। বিস্মিত। 'ও, তাই নাকি?'

'সে সব পরে হবে, আগে বন্দীরা যাতে দম আটকে না মরে সে ব্যবস্থা করতে হবে।' দৃঢ় পায়ে এগোতে শুরু করল রানা। 'কোথায় আছে ওরা?'

'সেলারে, স্যার।'

'এখনও বের করা হয়নি?' আরেক ছোটখাট হাঁক ছাড়ল ও। 'গাধার দল! নাহ্, ওদের আগে এইসব অপদার্থের ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি।'

আলালের দিকে ফিরল রানা। 'চলো চলো, আগে বন্দীদের পিছনের বাগানে নিয়ে যাই। ওখানে খোলা জায়গায় ভয়ের কিছু থাকবে না।' গার্ডের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা তাড়াতাড়ি আগুন নেভাবার ব্যবস্থা করো।'

'জ্বি।'

'সেলার কোনদিকে?'

ওদিকে অসহায়ের মত চ্যাঁচাচ্ছে ডন। 'আমাকে বের করো! ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। আমার স্ত্রী···'

'চুপ্ করো!' আলি ধমকে উঠল। 'কোথাও যাচ্ছ না তুমি।'

ডনকে কাশতে শুনে চোখ কুঁচকে উঠল তার। খেয়াল করল ধোঁয়ার ঘনত্ব আগের চাইতে বেশ বেড়েছে, লোকটার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সে নিরুপায়, কর্নেলের হুকুম নেই নিজে থেকে কিছু করার।

ভারী পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল আলি, ধোঁয়ার মেঘ ঠেলে রানা ও আলালকে বের হতে দেখে চোখ কোঁচকাল। 'কে···?'

'ডন কোথায়?' ধমকের সুরে প্রশ্ন করল রানা।

অবাক হলো সে। চিন্তা-ভাবনা না করেই বলে বসল, 'এখানে। কেন? কে জানতে চায়?'

পাত্তা দিল না ও। 'যূথী?'

'অ্যাঁ!'

'যূথী?' একই সুরে, একই ভঙ্গিতে বলল ও।

'ও···ওপাশে আরেক রুমে।'

'ঠিক আছে।' ডনের বাঁধন দেখল রানা ঝুঁকে। 'জলদি খোলো একে, পিছনের বাগানে নিয়ে যেতে হবে।'

'কে দিয়েছে অর্ডার?' অনিশ্চিত চেহারায় প্রশ্ন করল আলি। 'কর্নেল মুরাদ?'

'নয়তো কে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। তাকাল এমনভাবে যেন বোকার মত প্রশ্ন করেছে লোকটা।

'ঠিক আছে। আমি বাগানে নিয়ে যাচ্ছি ওকে।'

'আমরা নিয়ে যাব,' কড়া চোখে তাকাল ও। 'তোমাকে ওর বাঁধন খুলতে বলেছি, তুমি তাই করো।'

আবার লোকটার চেহারায় অনিশ্চিত ভঙ্গি ফুটল, তবে মুখে

কিছু বলল না। শ্রাগ করে বাঁধন খুলতে লেগে গেল। প্রথমে হাতের বাঁধন খুলল, তারপর পায়ের। পরক্ষণে যা ঘটল, সে জন্যে কেউ তৈরি ছিল না। তখনও পুরো সিধে হতে পারেনি আলি, ডান পায়ে গায়ের জোরে তার থুতনিতে লাথি ঝেড়ে দিল ডন। এত জোরে লাগল ওটা যে রুমের অর্ধেক দূরত্ব উড়ে পেরিয়ে গেল ছোটখাট পাঠান।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে মেঝেতে পড়ে থাকল। কিন্তু যেই দেখল আবার তেড়ে আসছে ডন, এক ঝট্‌কায় পাশে পড়ে থাকা নিজের জিথ্রী তুলে নিল। তবে তোলা পর্যন্তই, আর এগোতে পারল না। আলালউদ্দিনের সাইলেন্সার পরানো একই অস্ত্রের এক সেকেন্ডের ব্রাশে গোটা মাথাটাই পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল তার।

থতমত খেয়ে ব্রেক কষল সাংবাদিক, চোখ কপালে তুলে ওদের দিকে তাকাল। রানাকে হাসতে দেখে আরও বাড়ল বিস্ময়।

'শান্ত হোন,' বলল ও। 'আর ভয় নেই, আমরা আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি। চলুন, আপনার স্ত্রীকে বের করি আগে।'

তালেবান মোল্লার মুখে খাস বাংলা শুনে বিস্ময়ের মহাসাগরে হাবুডুবু খেতে লাগল ডন। অনেক কষ্টে বলল, 'আপনারা…?'

'বাংলাদেশী,' মধুর হাসি দিল ও। 'ডকুমেন্টটা কোথায়?'

বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার দু'চোখ। 'ড-ড-ডকুমেন্ট! ও হ্যাঁ, ওটা আমার স্ত্রীর কাছে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'চলুন।' পরমুহূর্তে অন্য চিন্তা ঢুকল মাথায়। 'না, এখানেই থাকুন আপনি। আলাল, তুমি এঁকে গার্ড দাও, বন্ধ রাখো দরজা। আমি আসছি এখনই।'

রুমটা খুঁজে বের করতে পনেরো সেকেন্ডও লাগল না। ডনের সেলের দুই রুম পরে ওটা। দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে আলো

জ্বলছে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে নজর বোলাল রানা। একটা কাঠের প্যাকিং বক্সের ওপর ইরাজকে বসা দেখল, যূথী বসা রূমের আরেক কোণে। ওকে কি যেন বলছে লোকটা হাসিমুখে। পায়ের শব্দে দু'জনেই মুখ তুলল।

'তুমি জানো না বিল্ডিঙে আগুন লেগেছে?' জবাবদিহির সুরে ইরাজকে প্রশ্ন করল রানা। ডান হাত দেহের পিছনে আয়েশী ভঙ্গিতে বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

উঠে দাঁড়াল সে। লোকটা কে ভেবে পাচ্ছে না। 'জ্বি? শুনলাম প্রায় নিভে এসেছে নাকি!'

'তোমার মাথা!' গর্জন করে উঠল রানা। 'জলদি বের করো ওকে! বাড়ির ছাদ ধসে পড়তে যাচ্ছে, আর এদিকে তুমি বসে বসে গল্প করছ?' যূথীর দিকে ফিরল। 'বের হয়ে আসুন।'

চোখ কুঁচকে উঠল ইরাজের। 'কার অর্ডারে নিয়ে যেতে চাইছেন ওকে?'

'কর্নেল মুরাদ।'

'কোথায় তিনি?' অবিচল দেখাল লোকটাকে।

'আসছেন।'

'ঠিক আছে, আগে আসতে দিন। তার মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত...' বলতে বলতে নিজের জিথ্রী তুলল গার্ড। 'আমি...' আর বলতে পারল না। হাতের কাজও পুরো করতে পারল না।

পিছন থেকে আশ্চর্য ক্ষিপ্র গতিতে বেরিয়ে এল রানার ব্রাউনিং ধরা হাত, গলায় আর বুকে স্লেজহ্যামারের ভয়ঙ্কর দুই আঘাত খেয়ে উড়ে পিছনের দেয়ালের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ল ইরাজ। তারপর হুড়মুড় করে মেঝেতে। ভয়ে জমে গেল যূথী, হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। লাশটার দিকে তাকাল না পর্যন্ত ও, হাত বাড়াল যূথীর দিকে। 'আসুন. আমরা আপনাদের দেশে

ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।'

স্তম্ভিত হয়ে পড়ল সে। কয়েকবার চেষ্টা করেও কথা বলতে ব্যর্থ হলো।

'কই আসুন!' তাড়া লাগাল রানা।

'আপনি বাঙালী?'

'হ্যাঁ, এবং বাংলাদেশী। জলদি করুন। ডকুমেন্টটা কোথায়?'

'অ্যাঁ!!!' চুলের প্রান্তে পৌঁছে গেল তার চোখ।

'কামন, যূথী। ওটা দিন আমাকে। আমার কাছে নিরাপদেই থাকবে। এবং দয়া করে তাড়াতাড়ি আসুন। এরা ব্যাপার টের পাওয়ার আগে পালাতে হবে আমাদের।'

'কি? এই আগুন···এসব···'

'হ্যাঁ, এসব আমরাই ঘটিয়েছি। আসুন। আপনার স্বামী অপেক্ষায় আছেন।'

ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এল মেয়েটি, এক হাত উঠে গেছে মাথার পেছনে। এক মুহূর্ত পর খুদে এক ফিলম্ ক্যাসেট দেখা গেল সে হাতে। 'এই যে।'

নিল রানা। দেখেই বুঝল মিনক্স। ওটা জ্যাকেটের পকেটে চালান করে ঘুরে দাড়াল। 'আসুন।'

দরজা টেনে দিয়ে ডনের সেলে এল ওরা, রানার সঙ্কেতিক টোকা শুনে আলাল দরজা খুলে দিল। ভেতরে স্বামী-স্ত্রীর দু'হাত আলগা করে বাঁধতে নির্দেশ দিল রানা, নইলে অন্য গার্ডরা সন্দেহ করে বসবে। কাজটা শেষ হতে বেরিয়ে পড়ল ওরা—রানা আগে, আলাল পিছনে। যূথী ও ডন মাঝখানে। সিঁড়ি ভেঙে করিডরে উঠে এল দলটা, তারপর ডানে এগোল শহীদের উঁচু গলা শুনে। ধোঁয়া ততক্ষণে অনেক কমে গেছে, প্রায় পরিষ্কার দেখা যায় সব।

বড় এক হলরুমে এসে পড়ল ওরা। শহীদকে দেখা গেল শেষ

মাথায় কিচেনের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চার তালেবান গার্ডকে ধমক-ধামক মেরে কাজ করাতে। বালতি নিয়ে ছোটাছুটি করছে লোকগুলো। ওদের দেখে ইঙ্গিতে বাগানে বের হওয়ার দরজা দেখাল সে, 'তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে যান। বসিয়ে রাখুন বাইরে। অ্যাই, জলদি করো তোমরা। কর্নেল মুরাদ এসে পড়লে সর্বনাশ...'

দরজা খুলে পিছনের বাগানে বেরিয়ে পড়ল চারজনের দলটা। ওদের দেখে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল জাফর, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। 'সোজা চলুন, বস্। গ্র্যাভেল পথ ধরে সোজা। দেয়ালের কাছে পৌঁছে ডানে যাবেন।'

'আপনারা কারা?' প্রশ্ন না করে পারল না বিস্মিত সাংবাদিক। যদিও জবাব আশা করেনি, এবং এলও না।

বিনা বাধায় দেয়ালে বাঁধা টগ্‌ল রোপের মইয়ের সামনে পৌঁছে গেল দলটা। আলাল উঠল আগে, ওপাশটা দেখে নিয়ে ওদের সঙ্কেত দিয়ে গায়েব হয়ে গেল দেয়াল টপকে। এবার উঠল ডন, তারপর যূথীকে অনুসরণ করল জাফর। সবার শেষে রানা। তারপর টান করে বাঁধা লাইন ধরে নিরাপদেই এক এক করে নদী পার হয়ে গেল ওরা।

জাফর আহমেদ রয়ে গেল পাইলটের অপেক্ষায়। কিন্তু আসছে না কেন সে? এত দেরি করছে কেন?

'জল্‌দি করো, জল্‌দি!' ভেতরে তখনও চার গার্ডকে ব্যস্ত রেখেছে শহীদ। কোনদিকে তাকাবার সুযোগই দিচ্ছে না। তারাও রীতিমত তটস্থ আসমান থেকে পড়া দীর্ঘদেহী, অচেনা মোল্লার হুকুম পালনে। কিন্তু বেশিক্ষণ বহাল থাকল না পরিস্থিতি, এক তরুণ গার্ড পানি টানা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল।

'কিন্তু, স্যার, আগুন তো নিভে গেছে!' বলল সে।

'ননসেন্স! কয়লার স্তূপের চাপা আগুন যে কোন মুহূর্তে জ্বলে উঠতে পারে আবার। তাহলে এত কষ্ট সব মাঠে মারা যাবে।' এইবার সময় হয়েছে কেটে পড়ার, ভাবল সে। ব্যাটারা সেয়ানা হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

কিন্তু সুযোগ হলো না। বাইরে থেকে এক বয়স্ক ও এক তরুণ গার্ড এসে ঢুকল হলরুমে, শহীদকে রানা ভেবে ভুল করল প্রথমজন। 'এই যে, আপনি না বললেন কর্নেল মুরাদ আসছেন? কই, কোথায় তিনি?'

'আছেন নিশ্চয়ই ধারেকাছে কোথাও,' শ্রাগ করল পাইলট। 'হয়তো ওপরের রেডিও রূমে গেছেন।'

'আর বন্দীরা? ওদের বাগানে কেন নিয়ে যাওয়া হলো?'

অবাক হওয়ার ভান করল পাইলট। 'কে বলল বাগানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? ওরা তো সামনে দিয়ে গেল। আমি...' থেমে গেল সে অস্ত্র কক্ করার শব্দ উঠতে, ঘুরে তাকাল। লোকটার সঙ্গী তরুণ গার্ডকে দেখল ওর দিকে জিথ্রী তাক্ করে ধরে থাকতে।

'আমি ছিলাম সামনের গেটে,' বলল সে। 'ওই পথে যায়নি কেউ।'

'তোমার অস্ত্র ফেলে দাও,' প্রথমজন বলে উঠল শহীদের উদ্দেশে। 'সাবধান! একটু এদিক-ওদিক হলে মাথা ছাতু করে দেব।'

এ মাথার দড়ি খুলে অপেক্ষা করছে জাফর আহমেদ। নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট বেশি পেরিয়ে গেছে, এখনও শহীদের ফেরার নাম নেই দেখে উদ্বিগ্ন। জানে দেরির জন্যে কাঁচা চিবিয়ে খাবে মাসুদ রানা, তবু জায়গা ছেড়ে নড়তে পারছে না সে।

কি করা যায় ভাবছে, তখনই ভেতর থেকে কয়েকটা চড়া গলার চিৎকার ও কয়েক জোড়া পায়ের দৌড়ে আসার শব্দ শুনে চমকে উঠল। মুহূর্তে বুঝে ফেলল ঝামেলা হয়ে গেছে, আর দেরি করার উপায় নেই। যথাসম্ভব নিঃশব্দে পানিতে নেমে পড়ল সে, একই সময়ে একটা রাইফেল গর্জে উঠল। ডান বাহুতে যেন আগুন ধরে গেল, তীব্র যন্ত্রণায় সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল জাফর।

হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল দড়ি, মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলল আবার। টের পেল ডান হাত অবশ হয়ে আসছে। চারপাশের পানিতে বৃষ্টির মত গুলি পড়ছে দেখে ডুব দিল জাফর। একহাতে প্রাণপণে দড়ি চেপে ধরে থাকল, এগোবার শক্তি খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। অসহ্য যন্ত্রণায় চোখে আঁধার দেখছে।

এমনসময় দড়িতে টান পড়ল।

বেশ জোর ঝাঁকির সাথে ল্যান্ড করল কর্নেল মুরাদের কপ্টার, একটা স্কি ফ্র্যাকচার হয়ে গেল, কিন্তু তাতে কিছু মনে করল না সে। নামতে যে পেরেছে জায়গামত, তাতেই মনে মনে কৃতজ্ঞ। রোটর স্লো হওয়ার অপেক্ষায় না থেকে, নেমে পড়ল সে।

ঝুঁকে দ্রুত পায়ে এগোল টার্মিন্যালের দিকে। টার্মিন্যাল ভবনের বাইরে তার জন্যে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে ফুল ইউনিফর্মড্ এক তালেবান যোদ্ধা, কর্নেলকে দেখে কড়া এক স্যালুট ঝেড়ে দিল সে।

পাত্তা দিল না মুরাদ। তাকালই না। 'ইলেক্ট্রিসিটি ফেল হয়েছে কখন?' উঠে বসে প্রশ্ন করল রাগ রাগ গলায়।

'ঘণ্টাখানেক হবে, স্যার।'

'হুঁম!' চোখ কুঁচকে উঠল তার। 'জলদি চালাও।'

এত যত্ন করে সাজানো-গোছানো পরিকল্পনা এমন দ্রুত ওলট-পালট হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে দেখে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারল না মাসুদ রানা। সর্জেন্ট শহীদের সময়ের গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল, শিডিউলড্ সময়ের পিছনে পড়েই সমস্যাটা বাধিয়ে বসেছে ও, ভাবছে রানা। এদিকে আহাম্মক জাফর, সেও অমার্জনীয় অপরাধ করেছে।

সঙ্গীর জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে নিজেই মরতে বসেছে, এখন ঘাড়ে করে তার অজ্ঞান দেহ টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে দুশো গজ দূরে অপেক্ষমাণ টয়োটা পর্যন্ত। তার চেয়ে বিপদের কথা দলের নির্ভরযোগ্য এক পাইলটকে হয়তো হারিয়েছে ওরা।

অজ্ঞান জাফরকে টেইলবোর্ডে শুইয়ে দিল রানা, আলালকে তার পাশে তুলে দিয়ে ডন ও যূথীকে সামনে বসতে বলল। নিজে বসল চালকের আসনে। মুহূর্ত পর বাঘলান এয়ারপোর্টের দিকে পিক্-আপ ছোটাল। হেডলাইট জ্বালার দরকার হলো না, কারণ আলাল আগেই এটায় বিকল্প ইনফ্রা-রেড হেডলাইট সেট করে ফেলেছে। তারওপর সিইউবি ভিউয়ার পরা থাকায় ফুল স্পীডে ছুটতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না ওর।

উদ্বেগ অমূলক প্রমাণ হলো রানার, শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই পৌঁছতে পারল এয়ারপোর্টে। কোন বাধা এল না। ওকে উন্মত্তের মত ড্রাইভ করতে দেখে সারা পথ ভয়ে সিঁটিয়ে থাকল দুই সাংবাদিক, অপ্রত্যাশিত মুক্তির আনন্দ সম্ভাব্য মৃত্যুর আশঙ্কায় অনেক আগেই হাওয়া হয়ে গেছে। তবু মুখ খুলতে সাহস পেল না ওরা রানাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর আর চিন্তিত দেখে।

এয়ারপোর্টে এমার্জেন্সি বাতি জ্বলছে দেখে কন্ট্রোল টাওয়ার পার্কের একটু দূরে পিক্-আপ দাঁড় করাল রানা। বেরিয়ে এসে নকল দাড়িসহ যাবতীয় পরিধেয় ঝট্‌পট্ বদলে ফেলল। ওদিকে

ততক্ষণে জ্ঞান ফিরেছে জাফরের। নিজের মোডিক্যাল কিটের মরফিন পুশ করে তার ব্যথা গয়েব করে দিয়েছে আলালউদ্দিন। তবে প্রচুর রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে, কারও সাহায্য ছাড়া নড়তে পারছে না।

তৈরি হয়ে ডনের দিকে ফিরল রানা। 'আমরা দু'জন ভেতরে যাচ্ছি,' আলালকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল। 'কাজ সেরে টর্চলাইট জ্বেলে সঙ্কেত দেব, সাথে সাথে আমাদের এই আহত সঙ্গীকে নিয়ে চলে আসবেন আপনারা।'

'আমরা এখানে কেন এসেছি?' বলল যূথী।

'একটু পর জানতে পারবেন। যা বলেছি ভুলবেন না।' ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'আলাল, এসো।'

পরস্পরের দিকে তাকাল স্বামী-স্ত্রী, এক মুহূর্ত পর সামনে তাকিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল ওদের দু'জনের চিহ্নও নেই দেখে। চোখের পলকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে প্রেতের মত। জায়গামত পৌঁছে কাটার নিয়ে ফেন্সের ওপর ঝুঁকে বসল রানা, মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডে দুই মানুষ যেতে পারে এমন এক ফাঁক তৈরি করে ফেলল।

'এখানে থাকো,' আলালকে নির্দেশ দিল ও। 'কপ্টারের স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনলেই ওদের সঙ্কেত দেবে। পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে। বুঝতে পেরেছ?'

'জ্বি।'

ঢুকে পড়ল রানা। হেকলার বাগিয়ে সতর্ক পায়ে এগোল। কোন দরকার ছিল না, কম্পাউন্ড একদম ফাঁকা। জায়গামত পৌঁছে নীল জেট রেঞ্জারটাকে খুঁজে পেতে কোন সমস্যাই হলো না। তবে আরেকটা জেটরেঞ্জার থেকে ইগনাইটার প্লাগ খুলে এনে জুড়তে মূল্যবান কয়েক মিনিট সময় নষ্ট হলো। তারপর ককপিট লাইট

জ্বেলে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল চেক্ করল রানা, ঠিক আছে সব। লম্বা করে দম নিয়ে স্টার্টার বাটন টিপে দিল।

ভোঁতা 'হুপ্' শব্দ করে বাতাসে বাড়ি মারল প্রকাণ্ড ব্লেড; আড়মোড়া ভেঙে যেন নিতান্ত ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘুরতে শুরু করল। তারপর, প্রতি পাকে বাড়তে শুরু করল গতি। অস্ত্র বাগিয়ে উঁকি দিল রানা, উদ্বিগ্ন চোখে ওরা আসছে কিনা দেখার চেষ্টা করল। মনে হলো কয়েকটা ছায়া নড়ছে—হ্যাঁ, চারটে ছায়া। একটা আগে, তিনটে পিছনে।

ওরা তখনও বিশ গজ দূরে, এমন সময় একজোড়া ডিপড্ হেডলাইট দেখতে পেয়ে বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার। এদিকেই আসছে! যথেষ্ট দূরে আছে অবশ্য। একলাফে নেমে পড়ল ও, চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল আলালদের। সেই সাথে নীলচে সিগন্যাল লাইট দোলাচ্ছে পাগলের মত।

কাজ হলো। কষ্ট হলেও পা চালাবার গতি বাড়িয়ে দিল জাফর। ডন ও যূথীর কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে সে। ওদের তুলে দিয়ে আরেকবার হেডলাইট দুটো দেখে নিয়ে উঠে পড়ল রানা, দ্রুত চোখ বোলাল প্যানেলে। আরপিএম ৮৫তে শো করছে কাঁটা, বিকট আওয়াজ করছে এঞ্জিন, গোটা কপ্টার ঝাঁকি খাচ্ছে ভীষণভাবে। ওদিকে ব্যাপার টের পেয়ে গাড়িটা হঠাৎ হেডলাইট হাই করে হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসতে শুরু করল।

গুলি ছুঁড়ছে একনাগাড়ে। কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। বাগে পাওয়ার আগেই ভেসে পড়ল জেট রেঞ্জার, আকাশে ওটার কালচে কাঠামো দ্রুত ছোট হতে হতে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

নতুন বন্দীর ব্যাপারে কোনরকম চান্স নিতে রাজি নয় গার্ডরা। জানে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে, কর্নেল মুরাদ পৌঁছলে কপালে

যা আছে তা ঘটবেই, একে তখন তার সামনে ধরে দিয়ে কিছুটা হলেও রেহাই পাওয়া যাবে ভেবে ডনের সেলে আটকে রেখেছে তারা শহীদকে। শুধু আটকে নয়, হাত পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছে। দুই গার্ড পাহারা দিচ্ছে সেল।

ওদিকে ভেতরে নিজের আহাম্মকির জন্যে পস্তাচ্ছে সার্জেন্ট। আগে থেকে বেঁধে দেয়া সময়ের অতিরিক্ত নষ্ট করেছে সে বেশি বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে, এখন তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। বিরক্তি আর হতাশা চরমে পৌঁছুতে চ্যাঁচাতে শুরু করল সে। পশতুতে যত জঘন্য, বাছাই করা গাল জানা আছে, এক এক করে তার সব দুই গার্ডের উদ্দেশে ঝাড়তে লাগল। তবু গায়ে মাখছে না ব্যাটারা। ভেতরে আসছে না ওর মুখ বন্ধ করাতে, শহীদও কিছু করার সুযোগ পাচ্ছে না।

এক সময় হতাশ হয়ে ক্ষ্যান্ত দিল সে। সময় ফুরিয়ে গেছে বুঝতে পারছে, দলের সাথে যোগ দেয়ার কোন উপায় নেই আর। চলে গেছে ওরা। এখন যদি কিছু করতে পারে সে, কোনমতে এদের মুঠো গলে বের হতে পারে, বাকিটাও নিজেকেই করতে হবে। কারও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

কিন্তু কি করবে সে? এই অবস্থায় করার আছে কি? কন্টিনজেন্সি প্ল্যান অবশ্য আছে একটা, তা হলো মূল দল থেকে অ্যাকশনের সময় কেউ আলাদা হয়ে পড়লে তাকে শহরের ছয় মাইল দূরের বিশেষ এক জায়গায় পৌঁছতে হবে ভোর চারটের মধ্যে। পিক্ক প্যান্থার নিয়ে ওখানে অপেক্ষা করবে ড্রাইভার হেকমত আলি। জালাল ও হামিদাকে তুলে নিতে ওখানে থাকবে সে। যেখান থেকে থান্ডারবোল্ট ওয়ান মূল মিশন শুরু করেছিল, সেখানে। ওর মধ্যে যদি না পৌঁছায় সে বা তারা, চলে যাবে ওরা। সে যদি টীম লীডারও হয়, তবু। ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে

হলে তখন তাকে বা তাদেরকে নিজের চেষ্টায় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বোকামি যা করার করে ফেলেছে, ভাবছে শহীদ, এখন পালাতে হবে যে করে হোক। বাঁচতে হবে। হাজার শোকর যে আহত হয়নি সে, একদম সুস্থ আছে। হাত-পা, মাথা, কাজ করছে ঠিকমতই। অতএব বসে বসে চিন্তা না করে পালাবার চেষ্টা অবশ্যই করা উচিত।

হাতের বাঁধন খোলার চেষ্টায় লেগে পড়ল সে মনস্থির করে। বিসিআইয়ের প্রত্যেক অপারেটরকে পেশী নিয়ন্ত্রণ ও ম্যানিপুলেশনের যত বিদ্যে আছে, সব অনেক যত্নের সাথে শেখানো হয়। এই ট্রেনিং তাদের ক্যারিয়ারের অন্যতম মূল ভিত্তি। ওদের কাউকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হলে; যে বাঁধবে, তাকে প্রথমে দড়ি এবং নট্ সম্পর্কে হাফেজ হতে হবে। একটু পরই শহীদ টের পেল এ ব্যাটারা তা নয়।

কয়েক মিনিটের চেষ্টার পর বাঁধন খুলতে পেরে আশ্বস্ত হলো শহীদ। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসতে পরের পদক্ষেপ নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল। সবচেয়ে ভাল হয় বাথরুম দিয়ে চেষ্টা করলে। এ বাড়ি সত্যি সত্যি জেলখানা নয়, একটা আবাসিক বাড়ি, কাজেই বাথরুমে জানালা না হোক, ছোটখাট ফোকর নিশ্চয়ই আছে। ওর জ্যাকেটের কলারে সেলাই করে জুড়ে রাখা বিশেষ হ্যাকস' ব্লেড দিয়ে ফোকরের লোহার বার কাটা কোন সমস্যাই হবে না।

এবং বাথরুম নিশ্চয়ই বাড়ির পিছনদিকে কোথাও হবে। বের হতে পারলে কার্নিস হয়ে গাছ বেয়ে দেয়ালে পৌঁছানো কোন সমস্যাই হবে না।

তবে কাজে নামার আগে একটু অপেক্ষা করবে ঠিক করল শহীদ। ওর মন বলছে অন্য সুযোগ আসবে, এত কষ্টে যেতে হবে না। দেখা গেল ওর ধারণাই ঠিক। সুযোগ এল। প্রথমে কয়েকটা

উত্তেজিত গলা ভেসে এল, একটু পর কয়েকজোড়া ব্যস্ত ভারী পায়ের শব্দ। তারপর অনেকক্ষণ সব চুপচাপ। আবার উঠল পায়ের আওয়াজ, তবে এবার ধীর।

আওয়াজ একেবারে কাছিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে উঠে পড়ল ও, দু'হাত পিছনে রেখে পায়চারি করতে লাগল। আসলে লাফ দেয়ার জন্যে মনে মনে রেডি। চেহারায় যথাসম্ভব পরাজিত, হতাশ ভাব ফুটে আছে। দুই গার্ড ঢুকল গেট খুলে, বন্দীর হার মানা চেহারা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে একজন ঘোষণা করল, 'কর্নেল মুরাদ এসে পড়েছেন। এবার বুঝবে তুমি বিদেশী স্পাইদের সঙ্গে কি আচরণ করি আমরা।'

হাঁদা বুঝল না ব্যাপারটা, কিন্তু কয়েক হাত পিছন থেকে মুরাদ ঠিকই বিপদ টের পেয়ে গেল। চেঁচিয়ে গার্ডদের সতর্ক করতে চাইল সে, কিন্তু হলো না। নিজে পিছিয়ে সরে যাবে, তাও পারল না। ভারী বুট পরা পা ঝট্ করে তুলেই পাশ থেকে প্রথম গার্ডের হাঁটুর সামান্য ওপরে গায়ের জোরে লাথি মেরে বসল শহীদ, অনেকটা পোল-অ্যাক্স চালানোর ভঙ্গিতে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ম্যাচের কাঠির মত মুট করে দুই খণ্ড হয়ে গেল তার পা, আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ল সে।

পরক্ষণে দ্বিতীয় গার্ডের কাঁধে ঝোলানো জিথ্রী লক্ষ্য করে থাবা চালাল শহীদ, একই মুহূর্তে ডান হাতে ভয়ঙ্কর এক বাঁ হাতি পাঞ্চ বসিয়ে দিল তার সোলার প্লেক্সাসে। উড়ে গেল সে, দেয়ালে বাউন্স করে কেটে পড়ার চেষ্টায় ব্যস্ত কর্নেলের উরুর ওপর আছড়ে পড়ে তার গতিরোধ করল। এই ফাঁকে হেকলার নিয়ে একলাফে গেটের চার হাতের মধ্যে পৌঁছে গেছে শহীদ।

ওর কুঁচকি সই করে সবেগে ডান পা ছুঁড়ল কর্নেল, অস্ত্র পায়ের কাছে ফেলে পা-টা খপ্ করে দু'হাতে ধরে বসল ও, টান

মেরে তুলে ফেলল ওপরে। অন্য পা পিছলে গেল মুরাদের, পিঠ আর মাথা দিয়ে ঠাস্ করে মেঝেতে আছড়ে পড়ে গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়। চোখের সামনে সব ঘোলা হয়ে গেছে। সবকিছু কয়েকটা করে দেখছে সে।

দ্বিতীয় গার্ড উঠে পড়েছে দেখে কারবাইনের বাঁট দিয়ে আগের জায়গায় অরেক গুঁতো মেরে তার বিকৃত চেহারা আরও বিকৃত করে দিল সার্জেন্ট। লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেল থেকে। দরজা বাইরে থেকে লক্ করে চাবি ছুঁড়ে মারল অন্ধকার করিডরে, তারপর সামনে ছুটল।

সামনের দরজার বয়স্ক গার্ড হাঁ হয়ে গেল ওকে তীরবেগে ছুটে আসতে দেখে। ধাক্কা সামলে উঠে কাঁধ থেকে জিথ্রী নামাতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু হলো না। সার্জেন্টের ব্রাশ ফায়ারে দেহ নিখুঁত ভাবে দুভাগ হয়ে গেল তার। মেইন গেটের একমাত্র গার্ড ভেতরে গুলির আওয়াজ শুনে সতর্ক হলো ঠিকই, তবে একটু দেরিতে। গলায় আর পেটে তিন-চারটে গুলি খেয়ে উড়ে গিয়ে গেটের ওপর আছড়ে পড়ল সে। তার খোলা চোখের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেল শহীদ, বাধা দিতে পারল না, কারণ চোখ খোলা থাকলেও ওতে দৃষ্টিশক্তি ছিল না।

বেরিয়ে এসে মুহূর্তের জন্যে থমকাল সার্জেন্ট, কর্নেল মুরাদের গাড়ি নিয়ে ভাগবে ঠিক করে ঘুরে দাঁড়াতে গেল। ঠিক তখনই ওপরের কোন জানালা দিয়ে ব্রাশ ফায়ার হলো। পায়ের কাছে এক রাশ ধুলো আর নুড়ি উড়ল।

গাড়ির আশা বাদ দিয়ে দৌড় দিল সার্জেন্ট।

হামিদার চাচার বাড়ির কাছে যখন পৌঁছল সে, তখন প্রায় রাত তিনটা। জানে জালাল বা হামিদা কাউকে পাওয়া যাবে না এখন,

ওরা চলে গেছে, তবু একবার খোঁজ নিয়ে যাবে বলে থামল। অন্ধকার রাস্তা যতদূর মনে হচ্ছে ফাঁকা, কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। গাছের আড়ালে আড়ালে সাবধানে এগোল সে।

বাড়িটার সোজাসুজি রাস্তার ওপর পৌঁছে দাঁড়াল। ডানে-বাঁয়ে শেষবারের মত দেখে নিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল। ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। গেট খোলা কেন? একদম হাঁ করে খোলা, কেন? আর ওটা কি পড়ে আছে গেটের সামনে? এক পাটি জুতো না? তাই তো মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি?

ঝপ্ করে বসে পড়ল সার্জেন্ট। ধড়ফড় করছে বুকের মধ্যে। কি ঘটেছে এখানে? ওরা ধরা পড়েছে? কিন্তু কি করে? কেন? হামিদার বিশ্বাসঘাতকতা টের পেয়ে গেছে তালেবান সরকার? কিন্তু…কি করবে বুঝে উঠতে পারল না শহীদ। বাড়ির ভেতরে ঢুকবে না এখান থেকেই সরে পড়বে, ভেবে পেল না। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে, সময়মত নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে না পারলে গাড়ি চলে যাবে। কি করা যায়?

প্রায় এক মিনিট কান খাড়া করে বসে থাকল সে, যদি ভেতর থেকে কোনরকম সাড়া শব্দ আসে, সেই আশায়। এল না। অতএব সাহসে ভর করে উঠে পড়ল। কারবাইনে বেশি গুলি নেই, তাই রিপিট ফায়ারে সেট করল ওটা, তারপর যতটা সম্ভব ঝুঁকে এগোল। না, তেড়ে এল না কেউ। নিরাপদেই জুতোটার কাছে পৌঁছে গেল সে। দামী এবং আধুনিক জুতো–তার মানে এটা জালালেরই হবে।

ধুলোয় গভীর টানা-হ্যাঁচড়া এবং টায়ারের দাগ দেখে বুঝে ফেলল শহীদ কি ঘটেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফোঁস করে, মাথা নেড়ে আফসোস প্রকাশ করল। কিচ্ছু করার নেই এখন। আরও কিছুক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে আকাশ-পাতাল ভাবল

সে, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। এবং জমে গেল কাছেই ফোঁপানোর মত একটা শব্দ শুনে। আওয়াজটা লক্ষ্য করে ঝট্ করে অস্ত্র তুলল।

থমকে গেল কালো চাদর মুড়ি দেয়া মূর্তিটা দেখে। 'কে?'

'আ-আমি। হামিদা।'

অবাক হয়ে গেল সার্জেন্ট। 'হামিদা! আপনি এখানে···কি ব্যাপার?'

'জালালকে···' চাদরে চোখ মুছল মেয়েটি। 'জালালকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।'

'ওরা কারা? সরকারী গার্ড বাহিনী?'

'হ্যাঁ। আমার ভাই···'

'ভাই?'

'হ্যাঁ। আমার ভাই পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে ওদের।'

'সে কি!' তাজ্জব হয়ে গেল শহীদ।

ক'দিন আগে কাবুলের পার্কের সেই ঘটনা বলল হামিদা। 'নিশ্চই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে···'

'তাই বলে এইভাবে? ওরা আপনাকেও যে পেলে ছেড়ে দিত না, এই সহজ ব্যাপারটা দাউদের মাথায় এল না! কিন্তু···আপনি বাঁচলেন কিভাবে?'

'আমি···' থেমে আবার চোখ মুছল মেয়েটি, নাক টানল। 'আমি মাকে আর বড় বোনকে ফোন করতে শহরে গিয়েছিলাম। লাইন পেতে দেরি হয়ে গেল, এই ফাঁকে···বাড়ির কাছে এসে গাড়ি, অনেক লোক আর হৈ-চৈ শুনে লুকিয়ে পড়ি আমি।'

'কখন ঘটেছে এ ঘটনা?'

'এক-দেড় ঘণ্টা আগে।'

কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকল সার্জেন্ট। তারপর বলল, 'আমি খুব দুঃখিত, হামিদা। কিন্তু এখন কিছু করার নেই এ

ব্যাপারে।' অল্প কথায় মিশনের সাফল্য এবং নিজের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কথা জানাল সে। 'এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম বলে দেখে যেতে চেয়েছিলাম। না এলে তো ঘটনা জানাও হত না। ইশ্, কি বিপদেই না পড়া গেল।

নতমুখে মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'হ্যাঁ, মানে...'

'কিন্তু আপনি এখানে কেন অপেক্ষা করছিলেন শুধু শুধু? জায়গামত চলে যাননি কেন? আমি না এলে...'

'আমি লোকেশন চিনি না,' মিনমিনে গলায় বলল সে।

এক মুহূর্ত ভাবল সার্জেন্ট। 'চলুন তাহলে আমার সঙ্গে। সময় বেশি নেই ; তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হামিদা। যেতে চায়, কিন্তু পা গেড়ে আছে মাটির সাথে।

তাড়া লাগাল শহীদ। 'পিছনের কথা ভেবে লাভ নেই, হামিদা। শোকর করুন যে আপনিও ধরা পড়েননি। এখন চলুন, নইলে অনেক বড় বিপদে পড়তে হবে।'

তবু খানিক ইতস্তত করল মেয়েটি, তারপর চোখের পানি মুছে ঘুরে দাঁড়াল। 'চলুন।'

যথাসম্ভব দ্রুত এগোবার চেষ্টা করল সার্জেন্ট। কিন্তু হামিদার জন্যে হলো না। সময়মত পৌঁছানো গেল না। এসে দেখল চলে গেছে হেকমত আলি।

আট

উঁচু একটা রিজ টপকে জেটরেঞ্জারের উচ্চতা কমিয়ে আনল মাসুদ রানা। সামনে প্রশস্ত, গভীর উপত্যকা। চারদিকে হিন্দুকুশ পর্বতমালার অসংখ্য চুড়ো আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে–উঁচু-নিচু, সরু-চওড়া। কালচে দানবীয় আকৃতি।

'প্রায় এসে পড়েছি,' বলল আলাল ওরফে টাইগার। কোলের ওপর রাখা ম্যাপ দেখছে সে ম্যাপল্যাম্প বীমের সাহায্যে।

আরও ভাল করে সামনে দেখার জন্যে ঝুঁকল রানা। ক্যানোপির ভেতর দিয়ে নিচের ঊষর ল্যান্ডস্কেপ মোটামুটি পরিষ্কার দেখতে পেল তারার আলোয়। সাপের মত আঁকাবাঁকা একটা পাহাড়ী নদীও দেখা গেল, শুকিয়ে খাঁ-খাঁ করছে। বর্ষার সময় এগুলোই প্রচণ্ড স্রোতস্বিনী হয়ে ওঠে।

একটুপর পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাকা বিশাল এক শেলফ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'ওটাই।' পিছনে তাকাল, চেঁচিয়ে ডনকে জিজ্ঞেস করল, 'কি অবস্থা পাইলটের?'

সামনে ঝুঁকে পাল্টা চ্যাঁচাল সাংবাদিক, 'জ্ঞান ফিরেছে, তবে দুর্বল।'

'ওকে হেডসেট পরিয়ে দিন। কথা বলব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাজে লেগে পড়ল সে।

'এটা নয়, বস্,' ফস্ করে বলে উঠল টাইগার। টোকা দিল

ম্যাপে। 'আরও একটু সামনে যেতে হবে আমাদের।'

মেজাজ খিঁচড়ে গেলেও যথাসম্ভব চেপে রাখল রানা। 'কামন, আলাল, নেভিগেশন সম্পর্কে রেজিমেন্ট কিছু শেখায়নি নাকি তোমাকে?'

'আমিই বরং রেজিমেন্টকে অল্প-স্বল্প শিখিয়েছি, বস্,' বলল সিদ্ধান্তে অটল ট্রুপার। 'এটা সেই জায়গা নয়।'

'কিন্তু মাটিতে অতবড় করে কেটে বানানো সাইনটা তাহলে কিসের?'

'দেখতে ডি-চারের মতই লাগছে, তবে ওটা সেটা নয়।'

'ধুত্তোর!' বিরক্তি প্রকাশ করল ও। 'তাহলে?'

টাইগার মুখ খোলার আগেই ইয়ারফোনে জাফর আহমেদ ডেকে উঠল, 'বস্? আমি জেগে আছি।'

তার গলা শুনে বুকের ভার কিছুটা হালকা হলো রানার। 'কেমন বোধ করছ এখন, জাফর?'

'মোটামুটি, বস্। তবে সবকিছু দুটো করে দেখছি। মনে হচ্ছে মাথায় বেশ জোরে লেগেছে। ঘুম ঘুম লাগছে সারাক্ষণ।' একটু বিরতি দিল সে। 'আমি দুঃখিত, বস্। লেট করা উচিত হয়নি আমার ওখানে।'

'ওকে। এখন রেস্ট নাও।' পরক্ষণে ফুয়েল গজের ওপর চোখ পড়তে আঁতকে উঠল ও সশব্দে। 'ইয়াল্লা!' একটা লাল সঙ্কেত জ্বলছে-নিভছে গজ প্যানেলের ভেতরে।

'কি হয়েছে, বস্?' জানতে চাইল টাইগার।

'ফুয়েল গজ!' অস্ফুটে বলল ও। 'ফুয়েল তো শেষ! নিশ্চয়ই কোন লিক আছে ট্যাঙ্কে।'

'হয়ে গেছে কাজ,' বিড় বিড় করে বলল সে। 'এখন?'

'নিশ্চয়ই গুলি লেগেছে তখন।' পয়েন্টার দেখে মনে মনে

হিসেব কষল রানা। 'আর বড়জোর পাঁচ মাইল যেতে পারব।'

'কিন্তু...'

'কোন উপায় নেই। জায়গা সঠিক হোক, বেঠিক হোক, এখানেই নামতে হবে।'

স্টিক ঢিল করে ধরল ও, পিচ্ লিভার নিজের দিকে টেনে আনল ধীরে ধীরে। ঝাঁকি খেল জেটরেঞ্জার, ভয় পেয়ে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল যূথী। লিভার টানার গতি আরেকটু কমাল রানা, ঝাঁকি কমল, তবে একটু কাত হয়ে ঝুলে থাকল কপ্টার। ওদিকে ফুয়েল গজের দিকে তাকিয়ে চক্ষুস্থির হয়ে আছে ওর। লাল আলোটা একনাগাড়ে জ্বলছে এখন, পয়েন্টারের শুয়ে পড়তে আর সামান্যই বাকি। এতক্ষণ কেন ব্যাপারটা খেয়াল করেনি ভেবে দুঃখে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো ওর।

'নামছি!' চেঁচিয়ে বলল। 'সময় নেই! সবাই রেডি হও!'

ছুঁড়ে মারা পাথরের মত ঝাঁপ দিল জেটরেঞ্জার, পাগলের মত হেলেদুলে নামতে শুরু করল। নিচের মাটি সমতল না খাড়া, দেখার সময় নেই। কোনমতে নামতে পারলে বাঁচে রানা, কারণ যে কোন মুহূর্তে ট্যাঙ্কের শেষ ফোঁটাও ফুরিয়ে যাবে, মাটিতে পড়ে চুরমার হবে কপ্টার।

ও যা আশঙ্কা করেছিল, শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। জায়গাটা সমতল তো নয়ই, এবড়োখেবড়োও নয়, প্রায় খাড়া এক ঢাল। স্কি ঢাল ছোঁয়ার আগেই একটা ব্লেড বাড়ি খেল তার ওপরের কিনারায়। তারপর যা ঘটল, তা যেমন দ্রুত, তেমনি অস্পষ্ট, এবং ডবল ফাস্ট মোশন ছায়াছবির মত দুর্বোধ্য।

ঢালের ওপরের প্রান্তের এক বড় পাথরে 'টঙঙ!' শব্দে প্রথম বাড়িটা খেল ব্লেড, পরমুহূর্তে ফিউজিলাজ থেকে সবগুলো রোটর ও ট্রান্সমিশন ছিঁড়েখুঁড়ে ছিটকে আলাদা হয়ে গেল। এরপর

কপ্টারের দেহ আছড়ে পড়ল পনেরো ফুট নিচে ঢালের গোড়ায়। ভয়াবহ আওয়াজ উঠল ধাতব ও পার্সপেক্সের ক্যানোপি ভাঙাচোরার। এঞ্জিন এমন বিকট কিচকিচ আওয়াজ করে উঠল, মনে হলো যেন পূর্ণগতিতে ধাবমান এক্সপ্রেস ট্রেনের সবগুলো চাকা আচমকা জ্যাম হয়ে গেছে।

'জা প!' গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রানা, নিজের দিকের দরজার ভাঙা অংশে কষে এক লাথি মেরে রাস্তা পরিষ্কার করে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ল বাইরে। আলালও একই উপায়ে বের হলো অন্য পাশ দিয়ে। ওদিকে পিছনের স্টারবোর্ড দরজা ঝাঁকি খেয়ে আগেই খুলে গেছে, জাফরকে ধরাধরি করে একইসময় বেরিয়ে পড়েছে সাংবাদিক যুগলও। 'পালাও সবাই!' আবার চ্যাঁচাল ও।

ফুয়েল কক্ অফ করার জন্যে এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু এঞ্জিন কাউলিং থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে সে ইচ্ছে বাদ দিল, নিজেও ছুট লাগাল পড়িমরি করে। দশ গজের মত গেছে বোধহয়, এই সময় স্পার্ক করল প্রায় শুকনো এঞ্জিন, একটা ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিটের ওপর গিয়ে পড়ল তার কিছু, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটল। উজ্জ্বল কমলা রঙের আগুন হুশ্‌শ্ করে লাফিয়ে উঠল অনেক উঁচুতে।

স্পার্কের আওয়াজে দৌড়ের ওপর মুখ ঘুরিয়েছিল রানা, ঠিক তখনই ফেটেছে ট্যাঙ্ক। আগুনের প্রচণ্ড তাপে মনে হলো ভুরু পুড়ে গেছে বুঝি, শক্ ওয়েভ একটানে ওর বুকের সমস্ত বাতাস বের করে নিয়ে গেল। খক্-খক্ করে কেশে উঠল রানা। দৌড়ে এল আলাল। 'লেগেছে কোথাও, বস্?'

'না। তোমাদের?' জ্যাকেট থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগল ও।

'আমরা সবাই ঠিক আছি।'

জ্বলন্ত জেটরেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা নীরবে। যেমন হঠাৎ করে জ্বলে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎই নিভে যেতে শুরু করেছে আগুন। তার মানে তেল একেবারেই শেষ হয়ে এসেছিল। নামতে আরেকটু দেরি করলে কি হত ভেবে মনে মনে শিউরে উঠল রানা। হতাশ চোখে ডানে-বাঁয়ে তাকাল।

'তুমি ঠিকই বলেছ, আলাল। ভুল জায়গায় নেমেছি আমরা।'

'বস্, তবু তো বেঁচেবর্তে আছি,' হাসল সে। 'ট্যাঙ্কে ফুটো আরও দুয়েকটা বেশি হলে তো বাঘলানেই ল্যান্ড করতে হত। তার চেয়ে এ অনেক ভাল হয়েছে।'

'ঠিক, মাসুদ ভাই,' বলে উঠল জাফর। 'পায়ের নিচে শুকনো মাটি আছে, কাজেই আর চিন্তা কি?'

'চিন্তা আছে,' অন্যমনস্ক চেহারায় মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বি টীমের দেখা পেতে হলে অনেক পথ হাঁটতে হবে আমাদের।'

ডন এগিয়ে এল ওর দিকে। 'এখনও পর্যন্ত আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর সুযোগ হয়নি, মিস্টার...'

মাথা দোলাল রানা। 'তার কোন প্রয়োজন নেই। তবু যদি জানাতেই চান, পরে সুযোগ পাবেন। ভুল জায়গায় নামতে হয়েছে, বেশ খানিক পথ হাঁটতে হবে এখন আমাদের।'

'সেলারে আটক থাকার চাইতে এ অনেক ভাল,' বলল যূথী। 'বিশেষ করে টর্চারের ভয়ে...'

মেয়েটিকে দেখল ও। যথেষ্ট সুন্দরী, চোখ দুটো মায়া ভরা। 'টর্চার করেছে নাকি ওরা? খুব বেশি?'

'না, তেমন কিছু নয়।'

ওকে বারবার ছেঁড়া শার্ট টানাটানি করতে দেখে আলালের দিকে ফিরল রানা। 'তোমার জামা কাপড় যা আছে এঁকে দাও।'

'শুধু এক সেট কাবুলি ড্রেস আছে, বস্।'

'তাই দাও। তোমারগুলোই সেট হবে ওঁর। আর ভদ্রলোককে একটা জ্যাকেট দাও। তাড়াতাড়ি, দেরি করার সময় নেই।'

'এরা সবাই বস্ বলছে আপনাকে,' পোশাকের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে যূথী বলল। 'কেন? আপনারা কোন মিলিটারি···মানে, কম্যান্ডো···?'

'না,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সে সব কিছু নয়।'

'আপনারা খুব সংগঠিত মনে হচ্ছে,' ডন বলল এবার। 'যে কায়দায় আমাদের বের করে আনলেন, তাতে···'

'আমাকে রানা বলে ডাকবেন,' না শোনার ভান করল ও। 'কোন লৌকিকতার প্রয়োজন নেই।'

হাসির আবছা আভাস ফুটল ডনের মুখে। 'শুধু রানা? নো র‍্যাঙ্ক?'

এবার রানা হাসি ঠেকাতে পারল না। 'এখানেও সাংবাদিকতা, ডন? হ্যাঁ, আমি এক সময় আর্মিতে ছিলাম, বর্তমানে এক্স। মেজর।'

বিস্ময় ফুটল স্বামী-স্ত্রীর মুখে। মাথা ঝাঁকাল ডন। 'যা ভেবেছি।' একটু থামল। 'ঠিক সময়মত আমাদের উদ্ধার করে আনার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ, মেজর। আপনাদের অসংখ্য, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'মোস্ট ওয়েলকাম, ইউ বোথ। এবার তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে নিন। এখনই রওনা হতে হবে আমাদের। পরনেরগুলো ফেলে দেবেন না যেন।'

একটু পর অনেক উঁচুতে কোথাও একটা প্লেনের আওয়াজ শুনল সবাই। গতি আর আওয়াজ শুনে বোঝা গেল ওটা ফাইটার। চেষ্টা করেও ওটার দেখা পেল না কেউ। শুরু হলো দলের পদযাত্রা। অন্ধকারে পায়ে হেঁটে উঁচু-নিচু উপত্যকা ধরে চলা যে

কী কঠিন কাজ, হাড়ে হাড়ে তা টের পেল ওরা। সূর্য উঠল বেশ কিছুক্ষণ পর। তার আলোয় আফগান ছায়াহীন, নিষ্ফলা প্রান্তরের বিশালত্ব ও রূপ দেখে তাক্ লেগে গেল। অবশ্য রোদের তেজ বেড়ে উঠতে সে ভাব আর থাকল না, একটু ছায়ার জন্যে হাঁসফাঁস শুরু হয়ে গেল সবার।

সবচেয়ে বেশি কষ্ট হলো যূথীর। জুতো ছিল না বলে কম্টারের টায়ার কেটে পা মুড়ে বেঁধে দেয়া হয়েছিল ওর পা। কাজ হলো না তাতে। প্রথম বিশ মিনিটের মধ্যেই পায়ের নরম চামড়া ফেটেফুটে রক্তারক্তি কাণ্ড শুরু হয়। শেষদিকে এমন অবস্থা হলো যে পা দুটোকে আর পা বলে মনে হলো না, মনে হলো রক্তাক্ত দুটো মাংসপিণ্ড।

এক সময় ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে পড়েই গেল যূথী। আর এক পা চলারও শক্তি নেই। বিনা বাক্য ব্যয়ে আলালউদ্দিন এগিয়ে গেল সাহায্য করতে, ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে সমান তালে এগোতে থাকল। ঝাড়া চার ঘণ্টা পর গন্তব্যে পৌঁছল ওরা। এক জায়গায় হলো থান্ডারবোল্ট ওয়ান এবং টু।

মিলনের আনন্দ খানিকটা চোট খেল থান্ডারবোল্ট টুর, যখন সার্জেন্ট শহীদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার খবর শুনল ওরা।

কাবুল। সকাল দশটা।

এখন একটু ভাল বোধ করছে কর্নেল নাজাফ মুরাদ। বাঘলানের দুঃসংবাদ সে ফিরে আসার আগেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। এসেই তাই পড়তে হয়েছে হোসেন শাহ বরকতীর তোপের মুখে। প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে তালেবান বিপ্লবী কমিটির মীটিং বসে ফজরের নামাজের পর, একটু আগে ভেঙেছে তা।

ওখানে কি কি ঘটেছে. কি আলোচনা হয়েছে, সব এখন পুরো

মনে নেই কর্নেলের। তবে সে যে দুই স্পাইসহ তাদের উদ্ধারকারীদের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পাকড়াও করে কাবুলে হাজির করার কথা দিয়ে এসেছে, তা স্পষ্ট মনে আছে। কাজটা না করে উপায় নেই। কাউন্সিল মেম্বার একগাদা অশিক্ষিত, আধাশিক্ষিত মোল্লার সামনে যে-সমস্ত জঘন্য ভাষায় তাকে চুনকাম করেছে বরকতী, তাতে ও কাজ তার জীবনের পয়লা ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গরজ তার এমনিতেই ছিল, নিশ্চয়ই করত সে কাজটা, শুধু শুধু বেইজ্জত করা হলো। কোন প্রয়োজন ছিল না। আপনমনে মাথা দোলাল কর্নেল, কোন প্রয়োজন ছিল না।

কী আশ্চর্য! ভাবছে সে, তার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে গেল কি না কোথাকার কোন্ এক রেইডিং পার্টি? বাংলাদেশী কমান্ডো? ওদের প্রশংসা করতে হয়। তবে হ্যাঁ, যত ওস্তাদ পার্টিই হোক, শেষরক্ষা যে করতে পারবে না, তাতে কর্নেলের সন্দেহ নেই। সে জানে একজন সদস্য দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আরও একজন গুলি খেয়েছে পালাবার সময়। এদের দু'জনের জন্যে নিশ্চয়ই দলের পরিকল্পনা বদল হতে বাধ্য। তার ওপর জালাল তো আছেই।

মুরাদের অনুমান, অন্তত আজ রাত পর্যন্ত রেইডিং পার্টি তাদের অগ্রযাত্রা স্থগিত রাখতে বাধ্য হবে। কিভাবে এ দেশ থেকে বের হবে ওরা? এসেছে কি ভাবে? কোন লং রেঞ্জ এয়ারক্র্যাফটে করে? সে যাতে করেই হোক, এসেছে বটে, কিন্তু যেতে আর পারবে না। যে করে হোক সে ঠেকাবে ওদের।

কেন্ট ধরিয়ে টানের পর টান দিয়ে চলল সে। মনে মনে পরের করণীয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। হাতে আজকের পুরো দিন সময় আছে, এরমধ্যে দলটাকে ট্র্যাক করতে হবে। এ জন্যে তাকে প্রচুর

ক্ষমতাও দিয়েছে বিপ্লবী কমিটি। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে সারাদেশের পুলিস ও ট্রাফিক পুলিস বাহিনীকে তার অধীনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এই বিশেষ কাজের জন্যে। এবং তালেবান গার্ডদের। আসল কাজের বেলায় ব্যাটারা হোপলেস ঠিকই, তবে একেবারে ফেলনা নয়। দেশের আগা-মাথা, ডান-বাঁয়ের সর্বত্র, সর্বশেষ ইঞ্চি মাটি পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ওরা।

প্রতিটা হাইওয়েতে চেক-পয়েন্ট বসাবে সে ট্রাফিক পুলিস এবং ওদের সমন্বয়ে, বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালাবে। বন-জঙ্গল, পাহাড় খুঁজবে। প্রয়োজন পড়লে আর্মির সাহায্যও চাইবে। কর্নেল জানে, চাইলে ওদের সাহায্যও পাবে সে, কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অবশ্য। তা অনুমোদন পাওয়ায় তেমন অসুবিধে হবে না। এইডের গলা শুনে ধ্যান ভাঙল মুরাদের।

হাতে ধরা একগাদা কাগজ দোলাল সে। 'আপনি যে সমস্ত রিপোর্ট চেয়েছেন, তার সব নিয়ে এসেছি, স্যার।'

সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে সাদা সিল্ক্ শার্টের আস্তিন গোটাল সে কনুই পর্যন্ত। 'ইন্টারেস্টিং কিছু আছে?'

'একপলক নজর বুলিয়েছি, স্যার। ঠিকমত...'

'দেখি, আমাকে দাও।' কাগজগুলোর ওপর হামলে পড়ল কর্নেল। খস্ খস্ শব্দে উল্টে চলল একটার পর একটা শীট, টেলেক্স ও ফ্যাক্স মেসেজে অজস্র ভুল দেখে নাক দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল থেকে থেকে। 'হুঁম! চুরি যাওয়া কপ্টার ট্র্যাক করেছিল ওরা দেখা যাচ্ছে! দক্ষিণ-পশ্চিমে যাচ্ছিল ওরা। পরে অবশ্য হারিয়ে ফেলেছে। হুঁমম! অজ্ঞাত এয়ার ট্রাফিকের উপস্থিতি জেনেও কেউ রিপোর্ট করেনি দেখছি।' চোখ তুলল সে। 'এয়ারফোর্সের অ্যাকটিভিটিজ খুব বেশি মনে হচ্ছে?'

'জ্বি, স্যার। কয়েকজন ইরানী জিম্মি মারা যাওয়ায় ওরা সৈন্য

জড়ো করছে আমাদের সীমান্তে। ট্রুপ, আর্মার...'

'সে খবরে আমাদের দরকার নেই। আমি ভাবছি এয়ারফোর্স যদি বেশি ব্যস্ত থাকে, তাহলে আমাদের কাজে ওদের সাহায্য পাওয়া যাবে কি না।' হঠাৎ এক রিপোর্টের শেষ প্যারায় কিছু দেখে চোখ কোঁচকাল সে। 'এটা কি? এক ফাইটার পাইলট হিন্দুকুশ রেঞ্জে আগুন দেখেছে ভোররাতে?'

'আগুন?' বলল এইড। 'হয়তো রাখালদের শীত পোহাবার জন্যে হবে।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কর্নেল। 'রাত তিনটায়! তাও এতবড় আগুন যে পাঁচ মাইল ওপর থেকে দেখা যায়!'

'হয়তো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।'

দেয়ালজোড়া এক বিশাল ম্যাপের সামনে এসে দাঁড়াল কর্নেল। একটা কাঠের চক কম্পাস দিয়ে বাঘলান এয়ারপোর্টকে কেন্দ্র করে বৃত্ত আঁকল, দূরত্ব দেখা গেল ১৪০ মাইল। আরেক হিসেবে চুরি যাওয়া জেটরেঞ্জারের এক ঘণ্টার পথ। এবার ফাইটার পাইলটের গ্রিড রেফারেন্স অনুযায়ী সঠিক জায়গায় হলুদ চায়নাগ্রাফ দিয়ে একটা ক্রস আঁকল। বৃত্তের সামান্য বাইরে পড়ল ওটা।

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল কর্নেল। 'কোন রেসকিউ প্লেনের গাইডেন্স বীকনও হতে পারে ওটা।'

তাক্ লেগে গেল এইডের। 'তাই তো! এ কথা তো ভাবিনি!'

'ভুলও হয়ে থাকতে পারে আমার,' আরেকটা কেন্ট ধরাল কর্নেল। 'অনুমান করছি আজ রাতে হয়তো তেমন কিছু ঘটবে। তবু, দেখি একবার চেক করে।'

'আর ওই বাংলাদেশীর কি হবে?'

'ওর কি হবে তা বরকতী জানে। হাতের কাজ সেরেইনি,

তারপর যাব ব্যাটা মুখ খুলেছে কি না জানতে।'

'কি বললে?' বোকার মত হেকমত আলির দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'জালাল-হামিদা আসেনি? শহীদও না?'

'না, বস্। আসেনি ওরা।' কপালের ঘাম মুছল ছোটখাট মানুষটা। সারাপথ ঝড়ের বেগে প্যান্থার ছুটিয়ে নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছে গেছে সে। ক্লান্ত চেহারা, চোখ লাল।

'তুমি চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলে তো?'

'পাঁচ মিনিট বেশি অপেক্ষা করেছি, বস্।'

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ভীষণরকম অন্যমনস্ক। ওরা কেন এল না ভাবছে। কি কারণ থাকতে পারে? একের পর এক প্রশ্ন উদয় হচ্ছে মনে, একটারও উত্তর জানা নেই। শহীদের কথা ভেবে সবচেয়ে বেশি আফসোস হলো রানার। তার অভাব বহুকাল খোঁচাবে ওকে। বিসিআইয়ের অনেক দামী অ্যাসেট ছিল সার্জেন্ট।

'ঠিক আছে,' বলল ও সবার উদ্দেশে। 'সবাই বিশ্রাম করো এখন। সামনে আরও কঠিন পরিস্থিতি আসবে মনে হচ্ছে।'

ওদিকে গাছের ছায়ায় স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা জাফর আহমেদের দিকে এগোল রানা। খন্দকার জাহাঙ্গীর তার ওপর ঝুঁকে বসে আছে। 'কেমন আছে ও?'

'ভাল, মাসুদ ভাই,' বলল নার্স। 'আর ভয়ের কিছু নেই। ঘুমের ওষুধ ইনজেক্ট করেছি নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। এই সময় ওর পকেটফোনে ফয়েজ মোহাম্মদের উত্তেজিত গলা ভেসে এল, 'টেক কভার, বস্!'

ওদের সামান্য দূরের এক রিজের মাথায় বসে আছে লোকটা, নিচের উপত্যকার ওপর নজর রাখছে। সেদিকে তাকাল ও। 'কি

হয়েছে?'

'ভোরে যেখানে আপনাদের কপ্টার ক্র্যাশ করেছে, ওর কাছে একটা কপ্টার ল্যান্ড করেছে এইমাত্র।'

'নজর রাখো। সাইলেন্স।'

কিন্তু একটু পরই নির্দেশ ভঙ্গ করল সে। 'আরেকটা কপ্টার, বস্। ট্রুপস্ ড্রপ করছে, ছড়িয়ে পড়ছে ওরা।'

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করে বলে উঠল ও।

ডন এগিয়ে এল। 'কি হয়েছে, মেজর?'

'আমাদের ক্র্যাশড্ কপ্টারের খোঁজ পেয়ে গেছে ওরা,' আরেকদিকে তাকিয়ে জবাব দিল ও। 'ট্রুপস ড্রপ করেছে ওখানে।' কি ভেবে হাসল ও। 'আপনাদের মায়া ছাড়তে পারছে না ব্যাটারা।'

ডনও হাসল, তবে সেটা হাসি হলো না, হলো মুখ ভ্যাংচানো। 'তাই তো দেখছি। বিপদের কথা হলো। আমাদের উদ্ধার করতে এসে দলের দু'জনকে হারালেন, একজন প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। তারপর কপ্টার ক্র্যাশ···এখন আবার এই যন্ত্রণা। ভাবছি আসলে দেশে পৌঁছতে পারব কি না।'

জবাব একটু পরে দিল রানা। দৃঢ় আস্থার সাথে বলল, 'নিশ্চয়ই পারবেন! একবার যখন আপনাদের বের করে আনতে পেরেছি, দেশে অবশ্যই যেতে পারবেন।'

নিচু এক চৌকির ওপর বেঁধে রাখা হয়েছে জালালকে। পরনে কিছু নেই। সারা শরীর ঘামে ভিজে জবজব করছে। চোখের ছয় ইঞ্চি ওপরে জ্বলছে জোরাল শক্তির ইন্টারোগেশন লাইট। চোখ মেলতে পারছে না সে। সারাদেহে অসংখ্য পোড়ার ক্ষত, জ্বলন্ত সিগারেট ঠেসে ধরে এই হাল করা হয়েছে।

অসহ্য যন্ত্রণায় গলা ছেড়ে চ্যাঁচাচ্ছে সে। অথচ ওই গলা যে তার নয়, সে ব্যাপারে জালাল নিঃসন্দেহ। অমন কর্কশ, অমন বিকট গলা তার হতেই পারে না। অনেক মিষ্টি, ভরাট কণ্ঠ ওর। ছাত্র জীবনে চমৎকার গাইত। স্কুল-কলেজ জীবনের অনেক অনেক অনুষ্ঠানে গেয়ে প্রচুর পুরস্কার পেয়েছে। ওদের পোস্তগোলার বাড়িতে সে সব যত্ন করে সাজিয়ে রাখা আছে, কাজেই ওর বিশ্বাস, এই গলা তার হতেই পারে না। এ নিশ্চই অন্য কারও হবে।

আলোর পিছনের অন্ধকার থেকে আবার বেরিয়ে এল সিগারেট ধরা তিন আঙুল। তারপর গোটা হাত। 'বাঁচতে চাইলে সত্যি কথাটা বলে ফেলো,' বলল হাতের মালিক। 'তাহলে ছেড়ে দেয়া হবে তোমাকে। যদি চাও, তোমাকে পাকিস্তান-ইরান, যে কোন বর্ডারে পৌঁছে দিয়ে আসব আমরা। কিছু বলবে না কেউ। কারণ তোমার সাথে কোন লেনদেনের ব্যাপার নেই আমাদের। আছে ওদের সাথে, দুই সাংবাদিক আর তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া কমান্ডোদের সাথে। ওদের চাই আমরা। এখন বলো, কোথায় ল্যান্ড করবে প্লেন?'

জবাব নেই।

'বলো, জালাল। বলে নিজেকে বাঁচাও। একবার যখন তোমার নাগাল পেয়েছি, ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি তো কোন্ ছার, কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না আমাদের হাত থেকে। যদি আমরা স্বেচ্ছায় না ছাড়ি। কাজেই বলে ফেলো, আমরা কথা দিচ্ছি ছেড়ে দেব তোমাকে। শুধু ল্যান্ডিং স্পটের নামটা বলো।'

জালাল নিরুত্তর দেখে গালের ওপর সিগারেট ঠেসে ধরল এবার হাতটা। আরও দুটো হাত মাথার দুপাশের চুল ঠেসে ধরে রাখায় প্রাণপণ চেষ্টা করেও মুখ সরাতে পারল না সে, ঘরদোর

কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আবার।

একটু পর জ্বালাপোড়া কমে যেতে থামল। হাপরের মত হাঁপাল জালাল খানিকক্ষণ, ঢোক গিলতে চাইল। কিন্তু শুকিয়ে কর্কশ কাঠের মত হয়ে আছে গলা, উল্টে ব্যথা লাগল। একটু একটু করে উত্তেজনা কমে এল। হামিদার সুন্দর মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ছবিটা পরিষ্কার নয়, একটু ধোঁয়াটে। তবু মোটামুটি চেনা যাচ্ছে, সেই পটলচেরা চোখ, মনকাড়া মিষ্টি হাসি, সেই···

পাতলা চিনামাটির পীরিচের মত ভেঙে খান খান হয়ে গেল ছবিটা, আবার চেঁচিয়ে উঠল সে। এবার সিগারেট নয়, ব্যাটন ইলেক্ট্রোড প্রয়োগ করেছে ইন্টারোগেটর। ওটা জালালের অণ্ডকোষে ঠেসে ধরেছে। ওখান থেকে শুরু করে দেহে যত নার্ভ ট্র্যাক্ট আছে, সবগুলোর ওপর তীব্র জলোচ্ছ্বাসের মত আছড়ে পড়ছে অসহ্য, অকল্পনীয় ব্যথার একের পর এক ঢেউ। অজস্র রঙের খেলা দেখিয়ে চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে যেতে চাইছে। এক সময় সরে গেল জিনিসটা, ব্যথা কমে এল ধীরে ধীরে।

কিন্তু জালাল জানে আবার শুরু হলো বলে। হলোও তাই। অবশেষে দীর্ঘ সাড়ে চার ঘণ্টা পর মুখ খুলতে বাধ্য হলো সে। 'গুড!' খুশি হলো অদৃশ্য ইন্টারোগেটর। পানি খাওয়ানোর নির্দেশ দিল। পানি খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করল জালাল।

'গারদেজ,' কোনমতে বলল, এতই আস্তে যে নিজেও ঠিকমত শুনতে পেল না। 'গারদেজ।'

'কোথায়?'

'খাইবার পাসে। ওখানে গারদেজে এক পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপ আছে, সেখানে।'

একটু বিরতি। কারা যেন ফিসফিস করছে। তারপর কেউ ওর

কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'গুড বয়। নামটা আরও আগে বললেই পারতেন। অনর্থক এত কষ্ট সহ্য করলেন।'

ওরা নাম জেনেই খুশি। কল্পনাও করেনি জালাল এত নির্যাতনের পরও তাদের ভুল পথে পরিচালনার চেষ্টা করবে।

বড় এক গর্তে পড়ে জোর ঝাঁকি খেল মুড়ির টিন মার্কা ঝরঝরে বাসটা, তারপর থেমে পড়ল। সামনে কেবল ঊষর প্রান্তর, দিগন্ত বিস্তৃত হিন্দুকুশ আর উত্তাপের কাঁপা ধোঁয়া। সামনে পাহাড়ী, আঁকাবাঁকা রাস্তা বেশিদূর দেখার উপায় নেই। তবে যতদূর দেখা যায়, একদম ফাঁকা। শহীদের মনে হচ্ছে ভুল করে জনমানবহীন অন্য কোন গ্রহে চলে এসেছে ওরা, আর কেউ নেই এখানে।

আফগান-পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলের জুরম নামের ছোট্ট এক শহরের কাছে জায়গাটা। বাঘলানের বাইরে থেকে কয়েকবার বাস বদলে খানাবাদ ও ফাইজাবাদ হয়ে এখানে পৌঁছেছে ওরা—শহীদ ও হামিদা। মোটামুটি ষাট মাইল পথ এরমধ্যে পেরিয়ে এসেছে, কোন সমস্যা হয়নি।

আরও ত্রিশ মাইলের মত যেতে হবে। সীমান্ত শহর জেবেক পর্যন্ত, হামিদার আরেক চাচা থাকেন ওখানে। তাঁর বাড়িতে উঠবে আজ রাতের জন্যে।

আষ্টেপৃষ্ঠে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকা হামিদাকে দেখল সার্জেন্ট। লালচে পাহাড়ী ধুলোয় ভুরু-পাপড়ি সব একাকার হয়ে গেছে তার। চোখ লাল। থেকে থেকে কাঁদছে মেয়েটা জালালের কথা ভেবে। যাত্রীরা সব নেমে যাচ্ছে দেখে ব্যাপার বোঝার জন্যে শহীদও উঠল। জানা গেল দুপুরের খানা এখানেই সেরে নেবে ড্রাইভার, তাই আধঘণ্টা পর বাস ছাড়বে।

'মন খারাপ করার কোন কারণ নেই,' মৃদু গলায় ওকে সান্ত্বনা

দিল সার্জেন্ট। 'সহজ হতে চেষ্টা করুন।'

ঘুরে তাকাল হামিদা। হাসল জোর করে। 'জালালের ভাগ্যে কি ঘটছে...'

'শুধু শুধু ভাবছেন। আমিও তো ধরা পড়েছিলাম, কি করতে পেরেছে ওরা? জালালেরও কিছু করতে পারবে না কেউ, শিওর থাকুন।'

ওর চোখে ভরসা খুঁজল মেয়েটি। 'সত্যি বলছেন?'

'অবশ্যই!' জোর দিয়ে বলল সার্জেন্ট। 'জালালও ট্রেনিং পাওয়া, অমন এক কুড়ি মোল্লাকে ঘোল খাওয়ানো বেশি কঠিন কিছু নয় ওর জন্যে।' বলল বটে, তবে এত আস্থা নিজের কানেও অতিরিক্ত ঠেকল।

বড় চোখ আরও বড় হয়ে উঠল হামিদার। 'আপনি খুব ভাল মানুষ। আল্লাহ্ আপনার ভাল করুন।'

বাস খালি হয়ে গেছে। এক পাঠান বৃদ্ধ তখনও নামেনি। কাপড়-চোপড় দেখে অন্যদের তুলনায় বেশ গরীব মনে হলো তাকে। ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন কিছু বলতে চায়। বলছে না ভরসা পাচ্ছে না বলে। শহীদের সাথে চোখাচোখি হতে দ্বিধা কেটে গেল তার, লাঠিতে ভর দিয়ে এক পা দুপা করে এগিয়ে এল। ওদের দেখল কাছ থেকে।

'আপনারা খাবার কিছু আনেননি?'

'না, আমরা খুব তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছি বাসা ছেড়ে,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল হামিদা। শহীদকে দেখাল। 'আমার স্বামীর ঘুম খুব গাঢ়, ওঁকে জাগাতে দেরি হয়ে গেছে। ব্যস্ততার জন্যে খাবারের ব্যাগ আনার কথা মনেই ছিল না।'

দাঁতহীন মাড়ি দেখিয়ে হাসল বৃদ্ধ। জোব্বার পকেট থেকে বড় এক কাপড়ের পুঁটলি বের করল। 'নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে

আপনাদের! আমার ছেলের বউ একজনের তুলনায় বেশি খাবার দিয়ে ফেলেছে। বুড়ো মানুষ, এত খেতে পারি না।'

পোঁটলা খুলল সে পাশের সীটে রেখে। ভেতর থেকে বের হলো দুটো সেদ্ধ ডিম, দুটো যবের রুটি, দুটো সবুজ টম্যাটো ও খানিকটা বকরীর দুধের পনির। মুখ তুলে আবার হাসল বৃদ্ধ। 'নিন্, বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করুন। দেখবেন এতেই আমাদের সবার পেট ভরে যাবে।'

'কিন্তু আমরা···' না করে দিতে যাচ্ছিল সার্জেন্ট, মেয়েটির চোখের নীরব নিষেধ দেখে থেমে গেল।

'আপনি খুব দয়ালু,' হামিদা বলল বৃদ্ধকে। 'আল্লাহ্ চিরকাল পৃথিবীতে আপনার ছায়া বহাল রাখুন।'

চোখের পিছনে কেমন শিরশিরে অনুভূতি জাগল শহীদের। কান্না পেলে ওরকম হয়। বৈরী আফগানিস্তানের এক গরীব বুড়োর অযাচিত আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে গেল ও। মন কত বড় হলে মানুষ নিজের অন্ন সম্পূর্ণ অপরিচিতের মুখে তুলে দিতে পারে?

কিছু বলতে ভরসা হলো না ওর, আবেগে গলা কেঁপে যেতে পারে। জাফর সেদিন ভুল বলেছে, ভাবল সার্জেন্ট। আবদুর রহমানরা এক-আধজন আজও আছে পাঠান মুলুকে।

নয়

রাত ঠিক দশটায় মৃদু গুঞ্জনের সাথে স্টার্ট নিল দুই ল্যান্ড রোভার।

এগজস্টের চাপা খাঁকারি এবং লম্বা ঘাসে টায়ারের খসখস আওয়াজ তুলে হাইড আউট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও দুটো। পিঙ্ক প্যান্থার ওয়ান আগে।

সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত উপত্যকার যতদূর পারা যায় সার্চ করেছে ট্রুপাররা, তারপর ফিরে গেছে। ফয়েজ নিজে দেখেছে ওদের চলে যেতে। কাজেই এ মুহূর্তে ভয়ের কিছু নেই। তবু মাসুদ রানা কোনরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। নির্ধারিত রুট বাতিল করে অন্য পথে নির্দিষ্ট এয়ারস্ট্রিপে যাচ্ছে। গারদেজের ষাট মাইল উত্তরে জায়গাটা, নাম পারাচিনার। দুই জায়গাতেই এয়ারস্ট্রিপ আছে। অতীতে দুই অয়েল ফিল্ডের ছিল, বর্তমানে তেলের মজুদ নেই বলে সব পরিত্যক্ত।

কোনাকুনি যাবে ঠিক করেছে রানা। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে, ক্রস-কান্ট্রি অ্যাপ্রোচ ধরে। কয়েকটা রিজ পড়বে পথে, যাত্রা ধীর এবং কঠিন হবে। তবে সুবিধেও আছে তার। কেউ ওরকম বেপথে যেতে পারে, আফগানদের মাথায় তেমন সম্ভাবনার কথা ভুলেও জাগবে না।

সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিল রানা।

ব্যাক-আপ টীম লীডার সদরউদ্দিনের নেতৃত্বে প্যান্থার ওয়ান রয়েছে আগে। ট্রুপার হেকমত আলি চালাচ্ছে ওটা। পিছনে আছে দু'জন, আলালউদ্দিন ও আহত জাফর। ওদের একশো গজ পিছনে রানার প্যান্থার টু। ড্রাইভ করছে ফয়েজ মোহাম্মদ। ডন-যূথীসহ অন্যরা রয়েছে ওটায়। কথা আছে, যদি 'পয়েন্ট' ভেহিকেল সমস্যায় পড়ে, ওদের নিয়ে ছুট লাগাবে 'ট্রেইল'। অবশ্য সুযোগ থাকলে কাউন্টার অ্যাটাক চালাতে ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই পৌঁছল ওরা জায়গামত, তবে সমস্যা বেধে গেল ওখানে।

'সামনে মনে হচ্ছে বিপদ দাঁড়িয়ে আছে, মাসুদ ভাই।' রানার ক্ল্যানস্ম্যান রেডিও হেডসেটে ভেসে আসা সদরউদ্দিনের বলার মধ্যে যে উদ্বেগ আছে, টের পেতে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না।

ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। 'কি হয়েছে?' বলল ও, গলা টান করে সামনের গাড়িটা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না।

'এগিয়ে আসতে পারেন,' জবাব এল। 'এখানটা নিরাপদ।'

ফয়েজের কাঁধে টোকা দিল রানা। 'সাবধানে যাও।'

দুলে উঠে রওয়ানা হলো প্যান্থার টু। একটু একটু করে এগিয়ে প্রথমটার পাশে দাঁড়াল। প্রায় তিনশো ফুট উঁচু এক ক্লিফের আরেক মাথার ঢালের কাছে জায়গাটা। ঢাল বেয়ে নামলেই স্ট্রিপ। সদরউদ্দিনকে দেখা গেল ক্যানোপি ফেলে দাঁড়িয়ে আছে সামনের সীটে, স্টারলাইট স্কোপ পরে স্ক্যান করছে এয়ারস্ট্রিপ। জায়গাটা ওদের থেকে অনেক নিচে। স্কোপ খুলে রানার দিকে এগিয়ে দিল সে। 'দেখুন, বস্। ঘড়ির কাঁটার হিসেবে দশটা, একটা, আর চারটার দিকে তাকান। অন্তত চারজন করে আছে প্রত্যেক দলে।'

কপাল কুঁচকে উঠল ওর। দুশ্চিন্তার মেঘে চেহারা কালো। স্ট্রিপটা এক পাহাড়ী উপত্যকায়, মোটামুটি সমতল একটা মাঠ। একদিকে অযত্নে পড়ে থাকা জীর্ণ এক কাঠের ঘর আর কয়েকটা খালি তেলের ড্রাম পড়ে আছে, অন্যদিকে আছে রাখালদের তৈরি দু'তিনটে ছাপড়া। গরমের সময় ওপরের উপত্যকায় পশু ছেড়ে দিয়ে এখানে বিশ্রাম করে ওরা।

তিন গ্রুপকেই যথেষ্ট সময় নিয়ে দেখল রানা। স্ট্রিপের প্রান্তে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। থেকে থেকে তারার আলোয় ভোঁতা ঝিলিক মারছে ওদের গান মেটাল। দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না, তবে রানার সন্দেহ হলো লম্বা ব্যারেলের হেভি মেশিনগানও

আছে ওগুলোর মধ্যে। ঝাড়া পাঁচ মিনিট পর স্কোপ নামাল রানা, বাঁ চোখের নিচের একটা পেশী তিরতির করে কাঁপছে।

'অভ্যর্থনা কমিটি, বস্!' বলল ফয়েজ। নিবিষ্ট চোখে রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে। 'কিন্তু জানল কি করে?'

কিছু বলল না ও। একই চিন্তা আর সবার মাথায়ও ঘুরছে। রানা সার্জেন্ট শহীদের কথা ভাবছে, শত্রুর হাতে ধরা পড়েছে সে। মনে হয় খবরটা সেই বলে দিয়েছে। কিন্তু তার মত কঠিন মানুষ···মাথা দোলাল ও। আসলে কেমিক্যাল ট্রিটমেন্টের সামনে মানুষ অসহায়। যত কঠিনই হোক, এক পর্যায়ে মুখ খুলতেই হয়। সার্জেন্টের ওপর কি ধরনের অত্যাচার করা হয়েছে? আপনাআপনি গাল কুঁচকে উঠল ওর। শহীদই তো, না জালাল? অস্বস্তি লেগে উঠল রানার।

আরেকবার স্ট্রিপ স্ক্যান করল। একঘেয়ে কণ্ঠে বলল, 'হতে পারে হয়তো অনুমান করে নিয়েছে ব্যাটারা।'

'শহীদ বা জালালও বলে দিয়ে থাকতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না। দুইয়ে দুইয়ে যোগ করলে এ হিসেব যে কেউ মিলিয়ে ফেলতে পারে। ওরা জানে আমাদের চপার ক্র্যাশ করেছে। অথচ খুঁজে একটা লাশও যখন পায়নি, তখন ওদের ধরে নেয়া স্বাভাবিক আমরা মরিনি, বেঁচে আছি। এবং পালাবার ধান্ধায় আছি। এখান থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে ক্র্যাশের ঘটনা ঘটেছে, কাজেই কাছাকাছি এই স্ট্রিপ থেকে আমাদের পিক-আপের ব্যবস্থা হয়তো আছে ভেবে নিতে পারে ওরা সহজেই।'

হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিল রানা। জিভ দিয়ে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করল। 'আর মাত্র পনেরো মিনিট পর আলফা পতেঙ্গার ল্যান্ড করার কথা।'

'যাহ্! তাহলে···কি করবেন এখন?'

'কি আর! এই আশঙ্কার কথা ভেবে যে কন্টিনজেন্সি প্ল্যান করেছি, তাই ফলো করতে হবে। প্ল্যান "বি" অনুযায়ী···'

'মরে গেছি, বস্, সে যে আড়াইশো মাইলের ধাক্কা!' চোখ কপালে তুলে বলল পিচ্চি হেকমত আলি। 'গাড়িতে করে এত পথ···মার্ডার কেস, বস্।'

'তোমার হেকমতির ওপর আমার খুব ভরসা ছিল, হেকমত,' খোঁচা লাগাল সদরউদ্দিন। 'এখন দেখছি···'

'অ্যাই সদরঘাট, চোপরাও!' হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'ওস্তাদ-সাগরেদের মাঝখানে কথা বলতে এসো না!'

ওদিকে অবিশ্বাসে চোখ বড় হয়ে উঠেছে যূথীর। ধীরে ধীরে মাথা দোলাল সে ডানে-বাঁয়ে। যেখানে এমন জীবন-মরণের প্রশ্ন, সেখানে এই মানুষগুলো কি করে এমন ধীরস্থির থাকে, এত ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে, ভেবে পাচ্ছে না সে। ওরা কি আসলে মানুষ?

গোটা এস্কেপ প্ল্যান বরবাদ হয়ে গেছে, আর এরা কি না গল্প করছে বসে বসে! ঠাট্টা-কৌতুক করছে! ভয়ে-হতাশায় কাঁপুনি উঠে গেল মেয়েটির। কি হবে এখন?

ডন নড়েচড়ে বসল। 'আপনাদের কথার মধ্যে কথা বলা হয়তো ঠিক হচ্ছে না, তবু, কি ঘটেছে যদি জানান, খুশি হব আমরা।'

ঘুরে তাকাল রানা। চেহারা দেখে বুঝল ভয় পেয়েছে লোকটা, তবে প্রকাশ করতে চাইছে না। চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। খুলে বলল রানা। আগ্রহ নিয়ে শুনল সাংবাদিক, তারপর আপনমনে মাথা দোলাল। 'মনে হয় ওই দু'জনের একজনই বলে দিয়েছে এখানকার কথা।'

'মনে হয় না।'

'আমি শুনেছি আপনি তখন কি বলেছেন,' জোর দিয়ে বলল ডন। 'তবে আমার ধারণা, হাতের মুঠোয় জলজ্যান্ত সূত্র থাকতে কষ্ট করে কেউ অঙ্ক কষতে যাবে না। সোজা পথেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইবে। একটু চাপ দিলেই যখন ফ্যাক্টস্ জানা সম্ভব, তখন কেনই বা যাবে ওই ঝামেলায়?'

বিরক্ত হলো রানা। 'আমাদের প্রত্যেকের ইন্টারোগেশন রেজিস্ট করার ট্রেনিং নেয়া আছে, কাজেই...'

'নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কর্নেল মুরাদের ইন্টারোগেশনের হাতিয়ারগুলো যদি একবার দেখতেন!' শিউরে উঠল সে। 'বাপ্‌রে!'

আর কিছু বলল না ও, ভবিষ্যতের চিন্তায় ডুবে গেল। মাথা ঘুরতে শুরু করল প্ল্যান 'বি' কি করে সফল করবে ভাবতে গিয়ে। পরিকল্পনা যত সতর্কতার সাথেই করা হোক, যতই তার ওপর রিহার্সেল করা থাকুক, সত্যিকারের অপারেশন যে তার চেয়ে বহুগুণ কঠিন হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ঘামছে টের পেয়ে ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেল রানা। বিকল্প প্ল্যানের খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবতে গিয়ে বাস্তব পরিস্থিতির সাথে ভবিষ্যৎকে মেলাবার চেষ্টা করল। প্ল্যানিঙের সময় এমন কিছু নজর এড়িয়ে গেছে কি না; যার কথা আগে চিন্তা করা হয়নি, অথচ করা উচিত ছিল, সেসব নিয়ে অনেকক্ষণ মাথা ঘামাল। না, মনে পড়ছে না তেমন কিছু।

প্ল্যান 'বি' আগাগোড়াই ছিল অ্যাকাডেমিক এক্সারসাইজ, রুটিন ট্রেনিং। এখন তাকে কার্যকর করতে হবে। ভীষণ কঠিন, প্রায় অসাধ্য এক কাজ। পারবে তো ওরা?

'মাসুদ ভাই!' সদরউদ্দিন বলে উঠল। 'আড়াইশো মাইল

দক্ষিণে যেতে হবে ভাবতে মাথা ঘুরছে আমার।'

'আমারও,' স্বীকার করল ও। ইঙ্গিতে লোকটাকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে এল। 'ভেবো না, ঠিকই সফল হব আমরা শেষ পর্যন্ত। এখন এসো, একসঙ্গে সব সমস্যা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে প্রথমটা নিয়ে ভাবা যাক্। প্রথমে আমাদের দেখতে হবে ওরা যেন আলফা পতেঙ্গাকে গুলি করে নামাতে না পারে। ওটা আফগানদের হাতে পড়লে ইন্টারন্যাশনাল স্ক্যান্ডালের শিকার হতে হবে আমাদেরকে। ওটাকে আমাদের ধার দেয়ার জন্যে আমেরিকাও নাজুক অবস্থায় পড়বে।'

'কি করবেন ঠিক করেছেন?'

হাত নেড়ে স্ট্রিপ দেখাল রানা। 'প্লেন ল্যান্ড করলে ওদের হাতে পড়বে। কাজেই ওটা যাতে না নামে সে ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কোন সমস্যা নয়। আমাকে কি করতে হবে বলুন।'

'প্যান্থার টু-র দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে। ওদের সবাইকে নিয়ে কয়েক মাইল এগিয়ে থাকো তুমি। আমি প্লেন ভাগিয়ে দিয়ে আসছি।'

'জ্বি।'

এগিয়ে এসে ওয়ানের সাইড বিনে হাত ভরে দিল রানা। কারবাইনের এক বাক্স গুলি, কয়েকটা গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ ফিউজ ও সেফটি ফিউজের দুটো কয়েল ও এক কয়েল দড়ি বের করে পায়ের কাছে রাখল। সঙ্গে লাস্ট রিসোর্ট হিসেবে একটা ভেরি সিগন্যাল পিস্তল।

'সব নিয়েছেন, বস্?' বলল ফয়েজ।

'হ্যাঁ।' সদরউদ্দিনের দিকে ফিরল ও। 'তোমরা এবার রওনা হয়ে পড়ো। যদি আমি না আসি, যে করে হোক ওদের নিয়ে

উপকূলে পৌঁছতে হবে তোমাকে।'

'চেষ্টা করব, বস্।'

'শুধু চেষ্টা নয়,' মৃদু ধমক লাগাল ও। 'সফল হতে হবে তোমাকে।' পকেট থেকে যূথীর দেয়া খুদে ক্যাসেটটা তার হাতে তুলে দিল। 'এটা একমাত্র রাহাত খানকে দেবে তুমি, আর কাউকে নয়। এর জন্যেই এতসব।'

'আচ্ছা।' ওটা জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে রাখল সে।

'ফয়েজ, ওয়ান নিয়ে ক্লিফের গোড়ায় অপেক্ষা করো তুমি। আমি কাজ সেরে আসছি।'

'রাইট, বস্!'

মিনিট পুরো হওয়ার আগে গড়াতে শুরু করল দুই পিঙ্ক প্যান্থারের চাকা। সবাইকে নিয়ে চোখের পলকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে পড়ল রানা। খুদে ভরডিক পেন্সিল টর্চ জ্বেলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের কয়েক টুকরো কর্ডটেক্স ফিউজ কাটল প্রথমে, তারপর ওগুলোর সামান্য দূরে দূরে ছাল ছাড়িয়ে সেখানে কারবাইনের ৭.৬২ এমএম কার্ট্রিজ বাঁধল কয়েকটা করে। কাজ শেষ হতে ওগুলোকে জুড়ে দিল ফিউজের সাথে। সব মিলিয়ে যথেষ্ট দীর্ঘ হলো বেল্ট।

ফিউজের এক মাথায় আগুন ধরিয়ে দিলেই হয় এখন, বিরতি দিয়ে ফুটতেই থাকবে বুলেট। বেশ কিছু সময় চলবে ব্যাপারটা। আওয়াজ শুনে নিচের ব্যাটাদের মনে হবে শত্রু অনেক আছে বিপক্ষে! একইরকম তিনটে বেল্ট তৈরি করল রানা, দূরে দূরে ছড়িয়ে রাখল।

ওটা সেরে ট্রিপ ওয়্যার ও এল-টু ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড দিয়ে দুটো বুবি ট্র্যাপ তৈরি করল শত্রুর এদিকে তেড়ে আসার সম্ভাব্য পথের ওপর। ওয়্যার টান্ টান্ হয়ে থাকল হাঁটুর সামান্য নিচের

উচ্চতায়, একচুল প্রেশার পড়লেই গ্রেনেড ফাটবে। আরেকবার ঘড়ি দেখল রানা কাজ সেরে। আলফা পতেঙ্গা যদি শিডিউল মত আসে, তাহলে আর মাত্র দুই মিনিট সময় আছে।

বসে পড়ল। কর্পোরাল সদরউদ্দিনের কথা ভাবল। রানার আস্থা আছে, ও যদি নতুন করে দলের দায়িত্ব নিতে নাও পারে, ক্ষতি নেই। ওই লোকই পারবে বাকি কাজ সামাল দিতে। সে যোগ্যতা সদরউদ্দিনের আছে। অবশ্য শহীদ থাকলে তাকে দায়িত্বটা দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকা যেত।

আবার ঘড়ি দেখল ও—হয়ে গেছে সময়। ভাবতে না ভাবতে আওয়াজটা কানে এল, দৈত্যাকার চার অ্যালিসনের একটানা গুরুগম্ভীর গুঞ্জন। আওয়াজ শুনেই বোঝা যায় বেশ নিচু দিয়ে আসছে আলফা পতেঙ্গা। এ-চূড়া ও-চূড়ায় বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। খুদে রেডিও ট্রান্সমিটার মুখের কাছে তুলে ধরল রানা। 'থান্ডারবোল্ট টু আলফা পতেঙ্গা। স্পাইডার, আউট। রিপিট। স্পাইডার, আউট। ওভার।'

সাড়া নেই। তার মানে শুনতে পাচ্ছে না স্কোয়ার্ড্রন লীডার কাজী আনিস। নিশ্চই কোন গণ্ডগোল ঘটে গেছে।

একঘেয়ে ছান্দিক আওয়াজ বেড়ে গেছে হারকিউলিসের, আরও গম্ভীর হয়েছে। তার মানে ওটা নামছে, নিশ্চিত হলো রানা। সিবিইউ পরে উল্টোদিকের অসংখ্য চুড়োর মধ্যে দিয়ে প্লেনটা দেখার মরিয়া চেষ্টা করল রানা, তখনও দেখা নেই। সতর্কবাণী আরও দু'বার আওড়াল ও, ফল হলো একই। সাড়া এল না।

তারপর হঠাৎ করেই ওটা দেখা দিল। দানবীয় এক কালো বাদুড়ের মত দুই চুড়োর মধ্যে দিয়ে ঘুরে এ মুখো হলো আলফা পতেঙ্গা। আরও অনেকটা নেমে অ্যাপ্রোচের সাথে সমান্তরাল হলো। অপূর্ব, শ্বাসরুদ্ধকর এক দৃশ্য, ভাবল মাসুদ রানা। কিন্তু

এটা দৃশ্য দেখার সময় নয়, জান বাঁচানোর সময়।

পাইলটকে সতর্ক করার শেষ চেষ্টা করল ও, লাভ হলো না। হয় রেডিওতে কোন সমস্যা হয়েছে, নয়তো পাহাড়ী এলাকায় কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যে বাধা সবসময়ই দেখা যায়, তাই ঘটছে। সম্পূর্ণ নীরব রেডিও।

এমন সময় হঠাৎ আলো হয়ে উঠল স্ট্রিপের রানওয়ে। গাঢ় অন্ধকারে এত জোরাল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যেতে থতমত খেয়ে গেল রানা। ব্যাপার টের পেতে এক মুহূর্ত সময় লাগল।

ইমার্জেন্সি রানওয়ে ফ্লেয়ার জ্বেলে দিয়েছে ওরা! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রানার। বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'হারামজাদা!'

পুরো স্ট্রিপ দিনের মত আলো করে তুলেছে ওরা মার্কার ফ্লেয়ার জ্বেলে। ফাঁদে ফেলতে চাইছে প্লেনটাকে। এবং ফাঁদে পা দিয়েও ফেলেছে ওটা। আরও নেমে পড়েছে, হেভি আন্ডারক্যারিজ বেরিয়ে পড়েছে পেটের ফোকর ছেড়ে। মাটি ছুঁতে আর দেরি নেই। থাবা দিয়ে ভেরি পিস্তল তুলে নিল মাসুদ রানা, আকাশের দিকে তুলে ধরে ট্রিগার টেনে দিল। ফস্! করে আওয়াজের সাথে মোটা একটা ধোঁয়ার স্তম্ভ পাক্ খেতে খেতে সাঁ করে আকাশে উঠে গেল।

একশো ফুট ওপরে টকটকে লাল রঙের বিশাল এক ফুলঝুরি হয়ে বিস্ফোরিত হলো ওটা। কি ঘটল বুঝে উঠতে সময় লাগল নিচের ওদের, তারপরই এদিকে মুখ করে ঝলসে উঠল অনেকগুলো গান মাযল। শুধু ফ্ল্যাশই দেখতে পেল রানা, হারকিউলিসের বিকট হুঙ্কারের নিচে আওয়াজ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল।

ওদিকে ওটার ল্যান্ডিং হুইল একবার বাউন্স করল রানওয়েতে, পরক্ষণে আবার গুটিয়ে উঠে যেতে শুরু করল। একেবারে শেষ

মুহূর্তে বিপদ টের পেয়ে পাওয়ার লিভার টেনে দিয়েছে কাজী আনিস। ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে পড়লেও কর্তব্য ভোলেনি সে। এঞ্জিনের ভয়াবহ হুঙ্কারে কেঁপে উঠল হিন্দুকুশ পর্বতমালা, ক্রমেই বেড়ে চলেছে তা। বিপজ্জনক ধীরগতিতে, একটু একটু করে মাথা তুলল আবার আলফা পতেঙ্গা। ফিউজিলাজে আফগান ট্রুপারদের গুলির অসংখ্য ছিদ্র নিয়ে দ্রুত সরে আসছে স্ট্রিপ পাড়ি দিয়ে।

তাড়াহুড়োয় সবদিকে নজর রাখা বোধহয় সম্ভব হয়নি পাইলটের পক্ষে, মুহূর্তের জন্যে তাই একদিকে কাত হয়ে পড়েছিল হারকিউলিস, স্টারবোর্ড উইং মাটিতে ঘষা খেতে যাচ্ছিল আরেকটু হলে। শেষ মুহূর্তে সামলে নিল।

মানুষটার মনের অবস্থা বুঝে নিতে দেরি হলো না ওর। এত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেও যে ধাঁধা কাটিয়ে সময়োচিত কাজটা করতে পেরেছে, সে জন্যে মনে মনে হাজারবার তাকে ধন্যবাদ জানাল রানা। মন্ত্রমুগ্ধের মত হাঁ করে সামনে তাকিয়ে থাকল, মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ছে হারকিউলিসের আকার, সোজা ওরই দিকে আসছে। হাজারটা বজ্রপাতের মত কানের পর্দা ফাটানো শব্দ বাড়ছে তো বাড়ছেই।

প্রপেলারের বাতাসের প্রচণ্ড চাপ রানাকে বসে পড়তে বাধ্য করল, গাছের পাতা ছিঁড়েখুঁড়ে উন্মত্তের মত উড়ছে এদিক-সেদিক। ধুলোর ঝড় বইছে চারদিকে। উড়ন্ত দানবটাকে অনুসরণ করছে রানার চোখ, দেখতে দেখতে পুরো আকাশ ঢেকে ফেলল ওটা। এতই নিচ দিয়ে গেল যে ভয় পেয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো ও। পরক্ষণে সাঁ করে পিছনের এক চুড়োর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল আলফা পতেঙ্গা।

উঠে বসল ও। মুখে সন্তুষ্টির চওড়া হাসি ফুটল।

দশ

হালকা অস্ত্রের সাথে হেভি মেশিনগানের টানা ব্রাশ ফায়ারের শব্দে সচকিত হলো রানা, ফায়ার ক্র্যাকারের মত আওয়াজ করছে ওগুলো। আলফা পতেঙ্গার গুঞ্জন ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে দক্ষিণের আকাশ থেকে।

উঠে বসল ও, রানওয়ের আলোয় ছুটন্ত বেশ কয়েকটা কালো কাঠামো দেখতে পেল। সবার অস্ত্র অনুমানে রানার অবস্থানের দিকে তাক্ করা। নিজের তৈরি অ্যামিউনিশন বেল্টের মাস্টার সেফটি ফিউজে আগুন ধরিয়ে দিল রানা, দড়ির কয়েল কাঁধে নিয়ে দৌড়ে একপাশের ঢালে এসে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। পিছনে বিরাট এক সব্জি বাগান। চারদিক দেখে নিয়ে বাগান মাড়িয়ে ঢাল বেয়ে উল্টোদিকে দৌড়ে নামতে শুরু করল।

বেশ খানিকটা সরে আসার পর ওর বেল্টের প্রথম গুলিটা ফুটল, তারপর শুরু হলো একের পর এক বিস্ফোরণ। এলোপাতাড়ি, লক্ষ্যহীন ছুটছে গুলি ঠুস্ ঠাস্ করে। কয়েক মিনিট একনাগাড়ে দৌড়ে সামনেই এক বড় গাছ দেখে থামল রানা। প্রায় তিনশো ফুট খাড়া এক ঢালের প্রান্তে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। ওর কাঁধে যে দড়ির কয়েল আছে, সেটার দৈর্ঘ্যও ঠিক তিনশো ফুট।

গলা বাড়িয়ে নিচে তাকাল রানা, দম নিল লম্বা করে।

স্টারলাইট স্কোপে কুলাচ্ছে না, কালির মত অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখা যায় না নিচে। আচমকা ভয় গ্রাস করল ওকে। স্যাটেলাইটের ছবি দেখে এই ঢালের যে গভীরতা হিসেব কষে বের করেছিল বিসিআইয়ের বিশেষজ্ঞরা, তা ঠিক আছে তো? কোন ভুল ছিল না তো হিসেবে? দড়িতে যদি না কুলায়, ঝুলে থাকতে হবে ওকে? কিন্তু কতক্ষণ, যদি···

মন থেকে চিন্তাটা জোর করে ভাগিয়ে দিল রানা, এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। পিছনের ওরা প্রায় এসে পড়েছে, বেশ কয়েকটা টর্চলাইটের বীমের নাচানাচি দেখতে পাচ্ছে ও। অবশ্য যথেষ্ট নার্ভাস ব্যাটারা, ওর বেল্টের ব্রাশ ফায়ারের শব্দে একবার লাফিয়ে এদিকে পড়ছে, একবার ওদিকে।

কাজে লেগে পড়ল রানা, দড়ির এক মাথা গাছটার মোটা এক শেকড়ের সাথে শক্ত করে বাঁধল, অন্য মাথা কোমরের বেল্টের পিছনে আটকানো ইংরেজি আট সংখ্যার মত দেখতে ডিসেন্ডার ফ্রিকশন ব্রেকের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে নিচে ফেলে দিল। এবার ডান হাত পিছনে নিয়ে সুদীর্ঘ লেজের মত ঝুলন্ত দড়ি মুঠো করে ধরে লাফ দিল শূন্যে। তার আগে শেষবারের মত দেখে নিল একবার পিছনটা—গাঢ় অন্ধকার!

পর পর দুটো গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ার শব্দে দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর। মনে মনে ভাবল, ক'টা গেল?

ঝাঁপ দেয়ার সময় লাথি মেরে নিজেকে ক্লিফের দেয়াল থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে নিয়েছিল রানা। দশ ফুট মত ওটার সাথে ওর ব্যবধান ক্রমশ বাড়ল, তারপর কমতে শুরু করল। বিশ ফুটের মাথায় দেয়ালের কাছে এসে পড়ল ও, আরেক লাথি মেরে সরিয়ে নিল নিজেকে। বিশ ফুট পরপর লাথি মেরে নেমে চলল নিক্ষিপ্ত ঢিলের মত, প্রতি মুহূর্তে ব্রেক গলে সরসর করে বেরিয়ে যাচ্ছে

দড়ি, ফুরিয়ে আসছে।

খাড়া দেয়ালে রানাকে খুদে এক মাকড়সার মত দেখতে লাগছে। নিচের ঘন আঁধার হাঁ-হাঁ করে উঠে আসছে ওকে গিলে খেতে। একটু পর গতি কমাল ও বেশি তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছে ভেবে। গোড়ার দিকে এবড়োখেবড়ো রক ফেস থাকতে পারে, শেষ মুহূর্তে ওর কোন একটার সাথে গুঁতো খেয়ে হাঁটু ভাঙার ইচ্ছে নেই। অবশেষে নিচের শক্ত পাথরে পা রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল লম্বা করে। দড়ি তখনও কয়েক ফুট রয়ে গেছে।

নিজেকে হার্নেসের বাঁধনমুক্ত করার ফাঁকে খেয়াল করল ও, ওপরের গোলাগুলি থেমে গেছে। কয়েকটা কণ্ঠের দূরাগত পশ্‌তু হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে শুধু।

ঘুরে দাঁড়াল ও। ঠিক তখনই নীরবতা খান্ খান্ করে দিয়ে কাছেই কোথাও তীক্ষ্ণ হুইসল্ বেজে উঠল। পরপর দু'বার। ফয়েজ আহমেদ ডাকছে ওকে। আওয়াজ লক্ষ্য করে লাফাতে লাফাতে ছুটল রানা। কয়েক গজ যেতে না যেতে স্কোপে প্যান্থার ওয়ানের পিছনটা দেখতে পেল। তার এপাশে বড় এক বোল্ডারের আড়ালে বসা দেখা গেল লোকটাকে, স্কোপ দিয়ে রানার বাঁ দিকে, পিছনে কিছু দেখছে।

'জলদি করুন, বস্, জলদি!' ব্যস্ত গলায় বলল সে। 'একটা গাড়ি আসছে স্ট্রিপের দিক থেকে।' এক দৌড়ে চালকের আসনে উঠে বসল লোকটা।

'তাই নাকি? কত দূরে?' নিজেকে সামনের প্যাসেঞ্জার'স সীটে ছুঁড়ে দিল রানা। পিছনে তাকাল দরজা লাগিয়ে। 'কতজন?'

'দেখতে পাইনি, বস্!' দ্রুত ফার্স্ট গিয়ার এনগেজ করে বলল ফয়েজ। 'আওয়াজ শুনেছি কেবল।'

পরক্ষণে একযোগে চার চাকাই ঘুরতে শুরু করল প্যান্থার

ওয়ানের, একরাশ ধুলো-কাঁকড় ছড়িয়ে ভীতচকিত হরিণের মত লাফ দিল ওটা, ছুট্ লাগাল তুফান গতিতে। পিছনে জাফর ও আলালকে দেখল রানা। চোখাচোখি হতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল দু'জনেরই। 'আপনার স্পাইডারম্যান অ্যাকশন দারুণ লেগেছে, বস্!' পরেরজন বলল। 'ভিডিও ক্যামেরা থাকলে পুরোটা তুলে নিতাম। স্পাইডারম্যান আমার ছেলের খুব পছন্দের হিরো।'

'বাবা আলালের ঘরের দুলাল, আসল কাজ করো,' জাফর বলে উঠল। 'সদরউদ্দিন টেনশনে আছে।'

কোন দরকার ছিল না মনে করিয়ে দেয়ার, কেননা মন্তব্য সেরেই কাজে লেগে পড়েছে সে। 'প্যান্থার ওয়ান টু টু,' হেডসেটের মাধ্যমে বলল, 'মুভিং নাউ। কন্ট্যাক্ট। ওয়ান ভেহিকেল ফলোইং। আউট।'

হু-হু করে ছুটছে প্যান্থার ওয়ান অসমান সারফেসের ওপর দিয়ে, নৌকার মত দুলছে। থেকে থেকে লাফ দিচ্ছে। এক সময় পিছনের গাড়িটা আড়ালে পড়ে গেল, অনেকক্ষণ আর দেখা নেই। খসিয়ে দেয়া গেছে ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে যাচ্ছিল ফয়েজ, এমন সময় হঠাৎ সামনের এক রকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওটা। ওদের মত ওটাও হেডলাইট অফ করে ছুটছে।

অনেক কষ্টে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াল ফয়েজ, ওটার নাকের সামনে দিয়ে কামানের গোলার মত আড়াআড়ি ছুটে গেল। ওটাও ল্যান্ড রোভার, তবে প্যান্থার ওয়ানের সাথে কোন তুলনাই চলে না। তিন আফগান রেগুলার বসা ছিল ভেতরে, নাকের সামনে দিয়ে কিছু একটাকে ভোঁ করে হাওয়া হয়ে যেতে দেখে ভয়ে, মহাবিস্ময়ে হাউমাউ করে উঠল সবাই।

ব্রেক কষে বড় এক লূপ তৈরি করে ঘুরল আফগান রোভার, পিছু নিল প্যান্থার ওয়ানের। ফয়েজ ততক্ষণে নেমে পড়েছে

খটখটে শুকনো এক নদীতে। অসমান, ফেটে চৌচির ওয়ে যাওয়া মাটির ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটছে সিকি টন ওজনের দানবীয় পিঙ্ক প্যান্থার।

'ইয়া মাবুদ!' ক্রমাগত ঝাঁকি সামলাতে ব্যস্ত আহত জাফর অস্ফুটে বলে উঠল। 'মোল্লাদের হাতে না মরলেও ব্যাটা ফয়েজের হাতে আজ নির্ঘাত মরব আমি।'

'আরে চোপ্!' ধমকে উঠল সে। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল পিছনে হেডলাইট জ্বলে উঠতে দেখে। আর লুকোচুরি খেলতে রাজি নয় আফগানরা। ওরাও নেমে পড়েছে নদীতে, তেড়ে আসছে। তবে আলোয় তেমন সুবিধে হচ্ছে না বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। গাড়ির দোলের সাথে মাতালের মত এদিক-ওদিক করছে বীম। সামনে নয়, ওপরে-নিচে আর ডানে-বাঁয়ে দেখছে কেবল ওরা।

সামনে থেকে এক পাহাড় এগিয়ে আসছে দেখে নদী ছেড়ে উঠে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল ফয়েজ। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, এমব্যাঙ্কমেন্ট প্রায় খাড়া দেয়ালের মত উঠে গেছে, ঢাল চোখে পড়ছে না কোথাও যেখান দিয়ে সহজে ওঠা যায়। নিরুপায় ফয়েজ ব্রেক কষল, মাছের লেজের মত পিছনটা তুলে জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল প্যান্থার।

'শা-লা!' বিড়বিড় করে বলল সে। গলা প্রায় অনুত্তেজিত।

'জল্‌দি!' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকিয়ে বলল রানা। 'জলদি করো!'

রিভার্স গিয়ার দিয়ে এত দ্রুত গাড়ি পিছিয়ে নিল ফয়েজ যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা। বেল্ট বাঁধা না থাকলে নির্ঘাত নাকমুখ থেঁতলে যেত। পিছন থেকে জাফর কাৎরে উঠল। ফের ব্রেক কষল ফয়েজ, খাড়া দেয়াল বেয়ে কোনাকুনি দৌড় শুরু করল।

বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হয়ে ছুটল প্যান্থার, হাতের কাছে এটা-ওটা ধরে শক্ত হয়ে বসে থাকল সবাই। গাড়ি উল্টে পড়তে পারে ভেবে আতঙ্কিত।

কয়েকবার হুমকি দিল ঠিকই প্যান্থার, তবে পড়ল না শেষ পর্যন্ত। চার হেভি থ্রেডেড স্যান্ড টায়ার মাটি কামড়ে ঠেলে তুলে নিয়ে গেল ওটাকে। ওপরে উঠেই লেজ দাবিয়ে দক্ষিণে ছুটল ফয়েজ। এরমধ্যে পিছনেরটা বেশ কাছে এসে পড়েছিল, আবার পিছিয়ে যেতে শুরু করল।

আপনমনে মাথা দোলাল ফয়েজ। 'ওটা আমাদেরটার চেয়ে অনেক হাল্কা, রাস্তায় কম্পিটিশনে পারব না আমরা, বস্।'

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'একটু স্লো করো। কাছে এগিয়ে আসতে দাও ওদের। আলাল, জিপিএমজি নিয়ে রেডি হও।'

'রাইট, বস্!' ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা।

রানা সীটের ওপর ঘুরে বসল। 'ওদের একশো মিটারের মধ্যে পৌঁছতে দাও। আমি বললে শূট করবে। হেডসেটটা দাও।'

বুড়ো আঙুল তুলল ব্যস্ত আলাল, নিজের ক্ল্যানসম্যান হেডসেট রানার হাতে তুলে দিয়ে চোখ রাখল সাইটে।

'ওয়ান টু টু,' বলল রানা। 'আমরা গতি কমাচ্ছি কন্ট্যাক্টের ব্যবস্থা করার জন্যে। এগিয়ে যাও। আর ভি অ্যাট ব্রিজ টু।' এখান থেকে আঠারো মাইল আগে জায়গাটা।

জবাব এল, 'রজার। গুডলাক।'

'আউট।' জাফরের হাতে হেডসেট ফিরিয়ে দিল ও। 'আলাল, রেডি?'

'জ্বি, বস্। একদম।'

চোখ কুঁচকে পিছনে তাকাল ও। বেশ দ্রুত মাঝের ব্যবধান কমিয়ে আনছে আফগান ল্যান্ড রোভার, হেডলাইটের আকার ক্রমে

বড় হচ্ছে। 'ফয়েজ, তোমার স্মোক গ্রেনেড রেডি?'

'রেডি, বস্।'

'গুড। তৈরি থাকো।'

দুই প্যান্থারের পিছনেই দুটো করে ফ্যান-শেপড্ ডিসচার্জার আছে, প্রতিটা হাউজিঙে আবার তিনটে করে টিউব আছে। এল-৭ ফসফরাস স্মোক গ্রেনেড ভরা আছে টিউবগুলোয়। ওর ধোঁয়া গায়ে লাগলে চামড়া পুড়ে যায়, বারোটা বেজে যায় ফুসফুসের। বোতাম টিপলে প্রায় একশো মিটার দূরে গিয়ে পড়ে ওগুলো।

এদিকে আলালউদ্দিন ব্রীচ লিড খুলে শেষমুহূর্তের ফীড ইন সেরে নিয়েছে। বেল্টের প্রথম দুই রাউন্ড কাজ সারতে সাহায্য করবে তাকে। ট্রেসার ওগুলো। ট্রিগার টানলেই বেরিয়ে গিয়ে চারদিক আলো করে পিছনের ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, একই সাথে আলালকে সুযোগ করে দেবে শত্রুর সঠিক অবস্থান ও হাই ভেলোসিটি জিপিএমজি শেল কোথায় পড়ছে, পরিষ্কার দেখে নিতে। ককিং হ্যান্ডেল টেনে সাইটে চোখ রেখে নিজেকে যথাসম্ভব স্থির রাখার চেষ্টা করছে সে।

ওদিকে তীব্র আলো পড়ায় রানার চোখ প্রায় বুজে এসেছে। আরেকটু। প্যান্থার ওয়ান এখন বেশ ধীরগতিতে এগোচ্ছে। ওর মনে হলো সময় থমকে দাঁড়িয়েছে বুঝি। মহাকাল থমকে দাঁড়িয়েছে ভয়াবহ কিছু ঘটার আশঙ্কায়।

'আর কদ্দূর, বস্?' অধৈর্য গলায় প্রশ্ন করল ফয়েজ।

'এসে গেছে,' ধ্যানমগ্নের মত বলল ও। ঠিক তখনই আনুমানিক একশো মিটার রেঞ্জে নাক ঢোকাল পিছনের ল্যান্ড রোভার।

কানের পর্দা ফাটানো শব্দে হুঙ্কার ছাড়ল আলালের জেনারেল পারপাস মেশিনগান। হঠাৎ করে আলো হয়ে উঠল পিছনের গোটা

এলাকা, পরমুহূর্তে বাঁকা এক রেখা ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে তপ্ত মৃত্যু ছুটে যেতে লাগল আফগান ল্যান্ড রোভারের দিকে। প্রথম দুই সেকেন্ডের মধ্যে হেডলাইট চুরমার হয়ে গেল ওটার, একটু পর ফ্লেয়ারও নিভে গেল। ফের গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল চারদিক।

ওদের কেউ আহত হয়েছে কি না বোঝা গেল না। তবে গাড়িটা যে পিছু ছাড়েনি, তা বোঝা গেল। শুধু আসছেই না, গোলাগুলি উপেক্ষা করে পাল্টা ব্রাশ ফায়ারও করছে। একটা প্যান্থারের সাইড বিনে লেগে 'টঙঙ!' শব্দ তুলল।

'ফয়েজ!' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'গ্রেনেড!'

সুইচের ওপর থাবা মারল করপোরাল, একইসঙ্গে ছুটে গেল ছয়টা এল-৭, ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠল প্যান্থার। দাহনকারী সাদা, ফসফরাস ধোঁয়া পলকে ঘন মেঘের মত ঘেরাও করে ফেলল পিছনের গাড়িটাকে। একদম গায়েব হয়ে গেল ওটা। ওরই মধ্যে আরেক দফা ব্রাশ ফায়ার করল আলালউদ্দিন, সশব্দে বার্স্ট করল ওটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক।

ফয়েজ আবার দৌড় শুরু করতে পিছন ফিরে বসা রানার থুত্‌নি আচমকা গেঁথে গেল সীটের ব্যাকে। ওই অবস্থায় মানুষের আবছা একটা কাঠামো দেখতে পেল ও, পিছনের রোভার থেকে নেমে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পাগলের মত ছোটাছুটি করছে। মশালের মত জ্বলছে তার সারা শরীর। বেল্টের শেষ গুলি খরচ করে লোকটাকে মুক্তি দিল আলাল।

বাঁক নিল প্যান্থার ওয়ান, পিছনের দৃশ্য আড়াল করে থাকা ছোট এক পাহাড়ের ওপরের আকাশ তখনও লালচে আভায় উদ্ভাসিত। পাহাড়ী আঁকাবাঁকা পথ ধরে ষাট মাইল বেগে ছুটল ফয়েজ। ব্রিজ টুতে পৌঁছতে পনেরো মিনিট সময় লাগল ওদের।

গভীর এক গিরিখাতের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল

প্যান্থার টুকে। প্রাচীন একটা পাথরের ব্রিজ আছে খাতের দু'পারের যোগাযোগ রক্ষার জন্যে–ব্রিজ টু। গাড়ি তো দূরের কথা, দেখে সন্দেহ হয় কয়েকজন মানুষও বোধহয় একসাথে হেঁটে পার হতে পারবে না, এতই দুর্বল চেহারা। যদিও ওরা নিরাপদেই পার হতে পারল।

নিঃশব্দ হাসি দিয়ে পরস্পরকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ প্রকাশ করল দুই দল। কিন্তু রানার মুখে হাসি নেই। 'দলে ওরা আরও আছে,' বলল ও। 'কাজেই বেশি খুশি হওয়ার কোন কারণ নেই। আগে ব্রিজটা ওড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে, সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের দেরি করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

কাজটা শেষ করতে পনেরো মিনিট লাগল ওদের। প্যান্থার টুর নেতৃত্ব ও ক্যাসেট এরমধ্যে আরেক দফা হাতবদল হয়েছে। যাত্রা শুরু করার আগে সবার উদ্দেশে বলল রানা, 'প্রথম সমস্যা কাটিয়ে আবার আমরা এক হতে পেরেছি, এটা একটা সুখবর। এখন থেকে মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত একসঙ্গেই থাকতে হবে। রাত এখন একটা, হাতে যথেষ্ট সময় আছে। এরমধ্যে যতদূর সম্ভব দক্ষিণে সরে যাব আমরা। আফগানদের সাথে যত ব্যবধান সৃষ্টি করা যাবে, ততই লাভ। যত দূরে যেতে পারব, ওদের সার্চ এরিয়াও ততই বড় হবে। এতে অনেক সুবিধে হবে আমাদের।

'এই পাহাড়ী পথ ধরে যাব আমরা। দশ মাইল দক্ষিণে পড়বে ব্রিজ থ্রী, ওটাও উড়িয়ে দিয়ে যেতে হবে। তারপর আরও ত্রিশ মাইল গেলে এক উপত্যকায় পৌঁছব আমরা। ওখানে ঘন বনের মধ্যে দিন কাটিয়ে আবার কাল রাতে রওয়ানা হব। ওকে, কারও কোন প্রশ্ন?'

পাঁচ সেকেন্ড অপেক্ষা করে মাথা ঝাঁকাল ও। 'চলো।'

ভোঁতা একটা বিস্ফোরণের সাথে হুড়মুড় করে ধসে পড়ল

পাথরের ব্রিজ, কয়েক মুহূর্ত পর শুরু হলো দুই পিঙ্ক প্যান্থারের দীর্ঘ যাত্রা।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল জালালের। মনে হলো বহুদিন সাগরের অনেক গভীরে ছিল সে, এখন সারফেসের দিকে উঠছে একটু একটু করে।

চোখ মেলল সে, সঙ্গে সঙ্গে যেন বোমা ফাটল মাথার মধ্যে। চট্ করে আবার চোখের পাতা বুজে ফেলল, টিপে ধরে রাখল শক্ত করে। ইন্টারোগেশন ল্যাম্পের তাপে চোখমুখ পুড়ে যাচ্ছে। কারা যেন কি বলছে কানের কাছে। কেউ একজন থুত্নি ধরে নেড়ে দিল। তার আঙুলে তামাকের মিষ্টি গন্ধ পেল সে।

'চমৎকার, মিস্টার জালাল!' বলে উঠল একটা কণ্ঠ। 'চমৎকার! আপনার সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার কথামত পারাচিনার এয়ার স্ট্রিপে ফাঁদ পেতেছিলাম আমরা। প্রায় সফলও হয়েছিলাম, কিন্তু…'

পূর্ণ সজাগ, সতর্ক হয়ে উঠল জালাল। বিপদের ডঙ্কা বেজে উঠল বুকের মধ্যে। পারাচিনার! পারাচিনারের কথা কি করে জানল ওরা? ভাবল সে, আমি বলেছি? নাহ্, আমি তো গারদেজের কথা বলেছি! হ্যাঁ, তাই তো! স্পষ্ট মনে আছে…!

'আপনি অবশ্য একটু চালাকি করেছিলেন,' ওর চিন্তায় বাধা দিল লোকটা। 'পারাচিনারের বদলে গারদেজের কথা বলেছিলেন। আমরা তাতে কিছু মনে করিনি। ভেবেচিন্তে দুই স্ট্রিপেই ফাঁদ পেতেছিলাম, কিন্তু… সে যাক্, প্লেনটার কোথায় নামার কথা ছিল সে তো আপনি জানতেনই। নেমেওছিল ওটা, বুঝলেন? কিন্তু আপনাদেরই কেউ সতর্ক করায় ভেগে গেছে শেষ মুহূর্তে, ধরতে পারিনি আমরা।'

বুকের মধ্যে চাপা উল্লাসবোধ করল জালাল। যাক্, তার মানে…

'কি বলছি শুনতে পাচ্ছেন? প্লেনটা নেমেই সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেছে। আমরা ওটাকে ধরতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু রেইডিং পার্টিও ওঠার সুযোগ পায়নি। ওরা এখনও এ দেশেই আছে।'

'পানি!' শুকনো ঠোঁট চাটল জালাল। 'একটু পানি!'

'নিশ্চই! নিশ্চই পানি পাবেন, কিন্তু তার আগে আরেকটু সাহায্য করতে হয় যে! মানে রেইডিং পার্টির কন্টিনজেন্সি প্ল্যান সম্পর্কে জানতে চাইছি আর কি! প্লেন ধরতে ব্যর্থ হলে কিভাবে, কোন্ পথে পালাবে ওরা?'

অসুস্থ বোধ করল জালাল। যেন খুব কষ্ট হচ্ছে, এমনভাবে চেহারা বিকৃত করে অস্ফুটে বলল, 'পানি! একটু পানি!'

'ব্যস্ত হবেন না। আগে বলুন পারাচিনার পিক্-আপ ব্যর্থ হলে বিকল্প কোন্ উপায়ে পালাবে ওরা, তারপর…'

'আমি জানি না।'

'তাই কি হয়?' অমায়িক হাসি ফুটল প্রশ্নকারীর মুখে। 'নিশ্চই জানেন আপনি। বলে ফেলুন।'

'বললাম তো আমি জানি না।'

'জানেন না? নাকি মনে করতে পারছেন না? আচ্ছা, দেখি, ব্যাটন ইলেক্ট্রোডের ছোঁয়ায় কাজ হয় কি না!'

একটু পর, অসহ্য যন্ত্রণায় গলার সমস্ত শক্তি এক করে চেঁচিয়ে উঠল জালাল, অথচ কর্নেল মুরাদের মনে হলো দুর্বল গলায় চিঁ চিঁ করছে একটা ইঁদুর।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

শকুনের ছায়া

[দ্বিতীয় খণ্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সাংবাদিক যুগলকে নিয়ে বিকল্প পথে পালাচ্ছে থান্ডারবোল্ট মিশন। মরুভূমি, বন-বাদাড় ভেঙে। পাক-আফগান বর্ডারের বিশেষ এক জায়গায় পৌঁছতে হবে ওদের, বিকল্প পিক্-আপ পয়েন্টে।

কিন্তু কর্নেল মুরাদ তা হতে দেবে না। আদাজল খেয়ে লেগেছে সে, ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে। রানাও নানান কৌশলে ফাঁকি দিয়ে চল্লেছে, কিন্তু কতক্ষণ?

অবশেষে রেজিস্তানের মরুভূমিতে ওদের ঘেরাও করল মুরাদ। আর উপায় নেই। মিশন ব্যর্থ হতে চলেছে। এখন?